প্রথমত নিবেদিত

প্রবন্ধ গ্রন্থ

অন্তু বিশ্বাস

Prothomoto Nibedito

By Antu Biswas

প্রকাশকঃ লেখক

প্রচ্ছদ নির্মাণেঃ লেখক

মূল্যঃ বইটি ফ্রি

প্রথমত নিবেদিত

প্রবন্ধ গ্রন্থ

অন্তু বিশ্বাস

উৎসর্গঃ
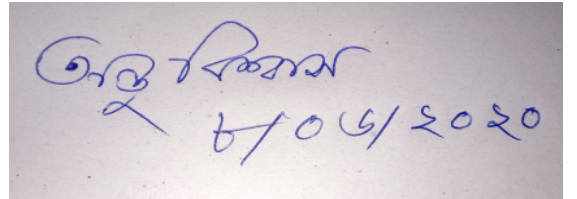
আমার মা কে

যিনি আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

প্রসঙ্গ কথাঃ

শুরুটা কবিতা দিয়ে হলেও প্রবন্ধ লিখতে আমার ভালো লাগে বেশি।চিন্তা করা যায় সেখানে।প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে, খানিকটা মনের কথাও বলা যায়।তবে যুক্তির সহযোগে।কাঁচা বয়সে অনেক আবেগ থাকে,মূলত সেই আবেগেই লেখা প্রবন্ধগুলি। খুব একটা তথ্যসূত্রের দরকার পড়ে নি;মগজে যখন যে যুক্তি এসেছে তখন তাই বলবার চেষ্টা করেছি।মূলত সবগুলো লেখাই বলতে গেলে,ফেসবুকের ওয়ালে প্রকাশিত।আর সেটি আমার অন্য একটি ছদ্মনাম বিশিষ্ট আইডি থেকে।বিভিন্ন ব্লগেও প্রকাশ হয়েছিল এর অনেকগুলো।সেগুলো নিয়ে –অনেকটা সম্পাদনা করে,শিরোনাম চেঞ্জ করে এই বই।পাঠক লক্ষ্য করবেন,ঘুরে ফিরে এসেছে শিক্ষার কথা;বিজ্ঞানের কথা।আসলে আমার মাথায় এখনো এই দুটি বিষয় ঘুরে বেড়ায়।আমি যেন এখনো সেগুলো নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি।

আসলে আমি চাইছিলাম,লেখাগুলো একজায়গায় থাকুক।সেই ইচ্ছে থেকেই এই পিডিএফ বই তৈরির কল্পনা।প্রিয় পাঠক বন্ধু,বইটি পড়তে শুরু করার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।অনেকগুলো ভুল থেকে যেতে পারে।অবশ্যই তা জানানোর অনুরোধ রইল।

সূচিপত্রঃ

আমরা যেন বিকশিত হই

“অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।”জানি না রবিঠাকুর কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেছিলেন?তবে নিজেকে বিকাশের যে উদ্দীপনা কবি উপলব্ধি করেছিলেন এখন এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই উপলব্ধি করা আমাদেরও বোধহয় খুব দরকার।আর এখানে আমরা আমাদের এই আর্জি জানাচ্ছি,আমাদের চিরচেনা 'স্কুল-কলেজগুলোকে'।কবিগুরুর মতো করে তাই আমরাও বলতে চাইছিঃ“অন্তর মোদের জাগিয়ে তোলো......”

জানি, এটা ঠিক হল না।তবে এটাই এখন আমাদের স্কুল-কলেজের কাছে একটা আবেদন হতে পারে। যেটা সত্যি, আমাদের স্কুল-কলেজ তো একান্ত জড় বস্তু।তারা তো আর শুনতে পায় না!তবে এই জাগিয়ে তোলার,বিকশিত করার কাজটি করবে কারা?

আর হঠাৎ 'জাগিয়ে তোলা' বা 'বিকশিত করা'র মতো শব্দ আসছেই বা কেন? কেননা,বর্তমানে এটি খুব দুর্লভ হয়ে পড়েছে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে।নোট পড়ার প্রবণতা এখনো সমান তালে আমাদের আছে।পরীক্ষা পাশের চির মোহ থেকে যেনো আমাদের মুক্তি নেই।আমরা যে মুক্তি চাই না তা নয়,কিন্তু মুক্তি দেওয়া হচ্ছে কি?যেখানে যাবেন সেখানেই পরীক্ষায় কী কী আসবে কী কী আসবে না তারই মহড়া দেখতে পাবেন।আদৌ জানার কিংবা জানার জন্য অদম্য তৃষ্ণার মতো কোনো উদ্দীপনা আপনি খুব কম লক্ষ্য করবেন।কিন্তু এই আপনি প্রশ্ন করে বসবেন,এতে কি বিকাশ হচ্ছে না?

'বিকাশ'—বিষয়টি নিয়ে এই অবকাশে কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে।এর মানে আমি যেভাবে বুঝে থাকি তাহল,সম্ভাবনাময় কোনো কিছুর নিরন্তর উত্তোলন অর্থাৎ মানব শিশু নিজেস্ব দেহগঠনের জন্য যে সম্ভাবনা(অনেক কিছু করার) তার রয়েছে তাতে ধীরে ধীরে তাকে দক্ষ করে তোলাকে আমরা বিকাশ বলতে পারি।কিন্তু স্কুল-কলেজ কি আমাদের সেই সুযোগটা দিচ্ছে?হয়তো আমরা এইমাত্র আমাদের মৌলিক প্রশ্নটি তুলতে

পারলাম!আপনি হয়তো আমার কথা মেনে নেবেন না।তবুও বলি,সত্যি কি আমাদের চোখে পড়ার মতো বা সেইভাবে বিকাশ হচ্ছে?স্কুল লেভেলে যতটা হয় কলেজে যেনো তার হারটা আরো কমে যায়!হ্যাঁ, আপনি বলবেন, যাদের হবার তাদের হবে।আর যারা আগ্রহী হবে না,তাদের হবে না।কিন্তু এখানেই আমার প্রশ্নটা,যারা আগ্রহী হচ্ছে না নিজেকে বিকশিত করায়, উন্নতি করায়—কেন তারা তাতে আগ্রহী হচ্ছে না?আমার মনে হয়,তাদের সামনে আগ্রহী হবার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরি করা হয় নি আদৌ!

স্কুল-কলেজকে আমরা এবার একটু সংকীর্ণ অর্থে নিয়ে যাই।তবে আপনার কাছে আবার ভালোও লাগতে পারে।আচ্ছা,আমরা স্কুল-কলেজকে জ্ঞান চর্চার কারখানা বলতে পারি কি?আমরা (যারা স্কুল-কলেজে পড়ছি) স্কুল বা কলেজ থেকে কি জানার আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরছি? কিংবা কোনো বিশেষ দক্ষতা অর্জনের উত্তেজনা নিয়ে? সম্ভবত না!তবে একেবারে আমি 'না' বলছি না।কেননা,এখনো এমন কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আছেন যারা সত্যি আমাদের স্বপ্নের যাদুকর। যাদের ক্লাস ঘন্টার পর ঘন্টাতেও ক্লান্তি আসে না।তবে এখানে আরেকটি বিষয় এসে কড়া নাড়ছে —

এই যে আমাদের চির চেনা 'ক্লাস' পদ্ধতি।এটাকেই একটু প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করানো যাক।ফ্রান্সিস কাপ্রা বলেছিলেন,"আমাদের সব সময় উচিত পুরোনো ধ্যান ধারনাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে রাখা।"আমরা যে ক্লাসে নিয়ত-অভ্যস্ত তাও একটা ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কি সেই ধারনাটা?

আমাদের ক্লাসগুলোর অবয়ব বিশ্লেষণ করলে হয়তো তার থেকেই একটা সুন্দর ব্যাখ্যা এসে যাবে।হয়তো একেবারে ঠিক হবে না।তবে তা অন্তত আমাদের চিন্তার খোরাক হতে পারে। মাঝে মাঝে বাস্তবতা থেকে দূরে গিয়ে চিন্তার সলিলে ডুব দেবার অভ্যাসটিও আমাদের দরকার।যে শিক্ষাটিও পাওয়ার কথা ছিল আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে।

যাইহোক যা বলছিলাম—আমাদের ক্লাসরুম!আমাদের ক্লাসরুমের একেবারে সামনে যিনি থাকেন তিনি আমাদের কাছে এমন একজন তিনি আমাদের থেকে বেশি জানেন।তিনি কিছু দিচ্ছেন, আমরা নিচ্ছি। প্রশ্ন করার অধিকার

আমাদের আছে।তবে অধিকাংশ ক্লাসে দুই একজন বাদে প্রশ্ন খুব কম আসে।তবে কি,অন্য যারা ক্লাসের ছাত্রছাত্রী তাদের কি জানার আগ্রহ নেই।আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না, সে কথা।বরং একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন,তাদের ভিতরে হয়তো প্রশ্ন তৈরি হওয়ার মতো উদ্দীপনা আমাদের শিক্ষিক মহোদয় দিতে পারছেন না।আরেকটা টার্ম আমি খুব ব্যবহার করি তাহল 'তথাকথিত খারাপ ছাত্রের' মনস্তত্ত্ব।অনেক সময় নিজেকে দিয়ে, বন্ধুদেরকে দিয়ে বিষয়টি আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি,আসলে তথাকথিত ক্লাসে যারা নিজেদেরকে খারাপ বলে ভাবছে আসলে তারা নিজের অজান্তেই নিজের চারপাশে একটা দেওয়াল নির্মাণ করে ফেলে যেটা অন্তত ক্লাসের সময় তথাকথিত ভালো ছাত্রদেরকেও তার থেকে বিভেদ করে রাখে,শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা বলা বাহুল্য।আর ফলশ্রুতিতে,তার ভিতর থেকে অনেক সময় প্রশ্ন তৈরি হলেও প্রকাশ পায় না।আমার কথাই বলি,আমি এমনিতেই ক্লাসে প্রশ্ন করি।আমার বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা আমার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে নেয় এবং উত্তর দেয়।তবে এমনও শিক্ষকের ক্লাস আমি করেছি, আমি দুটো তিনটে প্রশ্ন করার পর অন্য একটি প্রশ্ন আমার বন্ধুকে দিয়ে করাতে হচ্ছে।কেননা,ভাবছি শিক্ষক কি মনে করবেন!

আমরা আমাদের ক্লাসরুম নিয়ে কথা বলছিলাম।এখানে আমরা স্বশিক্ষিত হই খুব কম।আমাদেরকে যা দেওয়া হয়,তাইই আত্মস্থ করার চেষ্টা করা হয়।এবং আমরা নিজেরা বিষয়টা নিজেস্ব চিন্তা দিয়ে আবিষ্কারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হই যারপরনাই। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লাসরুমগুলো কেমন হবে বলে আমি মনে করি?

আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।আমি জানি এবং খুব ভালো করেই জানি এই পর্যন্ত আমি অনেক প্রশ্ন তুলেছি। কিন্তু অধিকাংশেরই উত্তর দিই নি।কারণ কি জানেন,আমি এর মধ্য একটা বার্তা দিতে চেয়েছি,আপনাকে প্রশ্নের উত্তর পাবার উত্তেজনা নিজের ভিতরে অনুভব করতে হবে। প্রশ্ন নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে।যে সুযোগটা আমাদের ৫০ মিনিট বা ১ ঘন্টার ক্লাসে খুব কমই থাকে।আমার ও ওই একই কথা,ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে এসে জ্ঞানচর্চা

করুক;জ্ঞানের সন্ধান করুক।শিক্ষক তার সহায়ক হোক মাত্র।আমি জানি,এ তত্ত্বটিতে অনেকেরই আপত্তি থাকবে।কিন্তু এটা আমার একটা নিজেস্ব মত।শিক্ষার অনেক গুলো তত্ত্বে মধ্যে এও একটি।তাহল, শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয় আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শিখুক।রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব,ইতিহাসের কোনো ঘটনা,রসায়নের কোনো বিশেষ বিক্রিয়ার কৌশল, গণিতের কোনো মেথড কিংবা পদার্থিবিজ্ঞানের কোনো ল! তাদের নিজেস্ব চিন্তায় ধরা দিক।এতে অনেকে মনে করতে পারেন,ব্যাপারটি অসম্ভব কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভব এবং একান্ত ভালো ভাবেই সম্ভব।সেক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন তাহল,আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগ্রহ তথা শিক্ষা বিষয়

তাদের মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারনা।আমার মনে হয় এভাবেই আমাদের স্কুল-কলেজ গুলো জ্ঞানের কারখানা হবে।গবেষনাও শুরু হতেই পারে।অনেকে এসব চিন্তাকে বালখিল্য বলে মনে করতে পারেন।তাদের সে সুযোগ আছে।তেমনি আমারো সুযোগ আছে একথা ভাবার, যদি এটা সম্ভব হয় তবে আমরা আবিষ্কারের জাত হয়ে ওঠবো।অনুসন্ধানী মগজ তৈরি হবে আমাদের।চেতনার সোপান নির্মাণ করতে পারবো আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

বিশেষত বর্তমানে চতুর্দিকে অন্ধকারে তলিয়ে যাবার যে মোহময় বিসর্জন দেখতে পারছি তা সত্যি আমাদেরকে ভাবাতে বাধ্য করে আমাদের স্কুল-কলেজের ভূমিকা নিয়ে।যারা জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকবে, ব্যস্ত থাকবে আরো আরো জানার অভিপ্রায়ে।অধিকারের প্রশ্ন কখনোই তাদের মাথায় উপ্ত হচ্ছে না।সত্য যেটা,তারাও নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে চাইছে।কিন্তু এই জানান দেবার পন্থাটা যে ভুল তা কি তাকে বোঝানোর মতো কোনো বিদ্যা দিতে পারা গেছে?পারা যায় নি।বোধহয় সেই জন্য,আমাদের এই অবস্থা।

আর এখানে দাঁড়িয়ে বোধ হয়, আমাদেরকে আবিষ্কারের নেশাটা ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছোট বেলা থেকেই।তবে রাজনীতি, সমাজ সম্পর্কে যেনো তারা জেনে নেয় নিজেস্ব চিন্তা দিয়ে,অভিজ্ঞতা দিয়ে।তবেই বোধহয় আমরা 'নিজেদেরকে মেলে ধরার মাধ্যমে পরিচালনার' একটা পরিসর পাবো।আর এটা সম্ভব হলে শান্তির সুবাতাস আমাদের গায়েও লাগবে।

মাতৃভাষাঃএকটি উপলব্ধির সূচনা

মাতৃভাষা হল মাতৃদুগ্ধ –মাতৃভাষার উপর এমন অনেক আপ্তবাক্য সেই ছোট্টবেলা থেকেই শুনে আসছি।মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব নিয়েও কত কিছু পড়ে আসছি।কিন্তু যতদিন না নিজের ভিতর থেকে বিষয়টি আবিষ্কার করতে পারছিলাম না ততদিন ‘মাতৃভাষা’ আমার কাছে অন্য অনেক বিষয়ের মতই ছিল সাধারণ।অন্য সকলে আলাদা ক্রেডিট দিলেও আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

তবে প্রশ্নগ্রস্থ মনের কবলে পড়ে নিজের ধারনার ইমারত গড়েছি ধীরে ধীরে।তখনও টেক্সটবুকস-এর বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।আসলে ঠিকভাবে জানতামই না যে তথাকথিত টেক্সটবুকস ছাড়াও আরেকটা ভূবন আছে।সত্যি বলতে কি আশে পাশের আর সকলের, এমন কি শিক্ষক সমাজের অধিকাংশেরই সেই জগতটাতে তেমন আনাগোনা ছিল না।তাই সেখানে প্রবেশের তেমন কোন রহস্যগাঁথাও শুনাতে পারতেন না তারা যে সেই দিকটাতে যেতে মন চায়।

যাই হোক বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র হওয়ার পর একটু অস্বস্তিতেই পড়েছিলাম।কঠিন কঠিন সব টার্মের কারসাজি বইয়ের পাতায় পাতায়;চতুর্দিকে সবাকার বিজ্ঞান ভীতি আরো আরো দুর্বল করে ফেলছিল আমাকে।কিভাবে কি করব বুঝে ওঠে পারছিলাম না।তখন আমাদের বাংলা শিক্ষকের সারসংক্ষেপে বলে যাওয়া নানা গল্পের সমাপ্তির খোঁজে পড়া শুরু করে দিলাম নানা বই।গ্রামের লাইব্রেরীতে আগে যাওয়া-আসা না থাকলেও যাওয়া শুরু হল।এর মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাশীল প্রবন্ধ আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করা শুরু করল।বিশেষত, শিক্ষা বিষয়ে নানা লেখালেখি যেখানেই পেতাম পড়ে ফেলতাম।ভাবনাচিন্তা পাল্টাতে লাগল ধীরে ধীরে।বলা চলে খানিকটা নিজেকেই নিতে হলো নিজেকে শেখানোর দায়িত্ব।যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবশ্যই সাহায্যকারী হিসাবে ছিল।তবে অনেক বিষয়ে

নানা প্রশ্নের উত্তর আমাকে নিজেকেই খুঁজতে হতো।এভাবে বাইরের বই আর টেক্সটবুকস পড়া সমানে চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমার টেক্সটবুকস-এর অনেক বিষয়ই নিজে নিজে বুঝে ফেলেছি।যদিও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান করার মত সক্ষমতা তখনও তৈরি হয় নি।মূলত তখন নজর ছিল বিষয়বস্তু গুলো বোঝা।যদিও পরে জেনেছি, তখন বুঝে নেওয়া অনেক ধারনা ভুল ছিল। হয়তো সেই জন্য ভিতরে ভিতরে একটা হীনমন্যতা কাজ করত।

একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করতাম,শুধু বিজ্ঞানের বই কেনো, যে কোন বই পড়ে একটু হলেও বুঝতে পারি।যা হয়তো আগে সাধ্যের বাইরেই ছিল।একবার, ভূগোলের কোন একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দেবো বলে একজনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম।বন্ধুর কাছ থেকে বই এনে উক্ত বিষয়ের উপর একেবারে গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলাম।অবশেষে সফল হলাম।

তখনো বাইরের বই বলতে একটা সীমানা ছিল।গল্প, উপন্যাস,প্রবন্ধ আর কবিতা।বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বা গোয়েন্দা সিরিজ পড়েছি বলে মনে হয় না।তবে খুব তাড়াতাড়ি কোন বই শেষ করতে পারতাম না।এ নিয়েও ভিতরে ভিতরে হীনমন্যতা কাজ করতো। যার জন্য দ্রুত পড়ার কলাকৌশলের উপরও কয়েকটি বই পড়েছি।কিন্তু তাতে বিশেষ কোন কাজ হয় নি।এক সময় বুঝলাম দ্রুত পড়া আর বই পড়ায় আনন্দ লাভ এক ব্যাপার নয়।তাই এখনো হয়তো কোনো কিছু তড়িঘড়ি করে শেষ করার প্রবণতা নিজের ভিতরে দেখতে পাই না।

আগেই বলেছি 'শিক্ষা' বিষয়টা ছিল আমার বরাবরই আগ্রহের বিষয়।এর পিছনে একটি কারণ ছিলো-আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের সমাজে বিদ্যমান হাজারো সমস্যার সমাধান হবে যদি কিনা 'শিক্ষা সিস্টেমে'র গলদগুলো দূর করা যায়।আর মানবিক হবার, মানুষের জন্য কিছু করা যে আমার দায়িত্ব —এই ব্যাপারটিও আবিষ্কার করেছিলাম।আর মানুষের জন্য কিছু করা মানেই মানুষের শিক্ষা নিয়ে কিছু করা-এই উপলব্ধি টা আমাকে শিক্ষা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শিখিয়েছি। অনেক প্রথাগত ধারনার বাইরে গিয়ে ভাবতে হয়েছে।যেমন, প্রাইভেট টিউশনি তথা শিক্ষা নিয়ে বানিজ্যের

বিরোধী হওয়া এবং নিজেকে কোন প্রাইভেট টিউটরের কাছে না নিয়ে যাওয়া।অতিরিক্ত জানানো টা আমার কাছে ফ্যাক্ট নয়, আমার কাছে বিষয় হলো-বানিজ্যিক মনোভাবের শিক্ষক গোষ্ঠি,যাদের একটা বড় অংশই আবার স্কুল কলেজের শিক্ষকতার সাথে যুক্ত।তবে আমার এই বিদ্রোহ কারও কাছে সহানুভূতি পায় নি। অনেকে আবার আরো আগ বাড়িয়ে আমার ব্যাপারে দুঃখানুভূতি প্রকাশ করেছেন।যদিও তা আমার কাছে যক্ষের ধন বলে কিছু মনে হয় নি বরং খারাপই লেগেছে।

তবে এই সময়টাতে অনেক বন্ধুদের সংস্পর্শে এসেছি।বিশেষত যারা বিজ্ঞানগ্রুপের ছাত্র ছিল না । এক সময় কয়েকজন মিলিত হয়ে গ্রুপ স্টাডি শুরু করি।মূল উদ্দেশ্য ছিলো এমন একটা প্লাটফরম তৈরি যেখানে বন্ধুরা নিজেদেরকে নিজেরাই শিক্ষা দিবে।প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।যাই হোক, কয়েকদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম বন্ধুদের অনেকেই তাদের নিজেস্ব বাংলায় লেখা টেক্সটবুকস পড়ে অর্থ উদ্ধার করতে পারছে না।ইংরেজির কথা ছেড়েই দিলাম।অথচ যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বই আমি তেমন ভাবে কোন দিন পড়ি নি কিংবা যে ইতিহাসের টপিকটার নামও শুনি নি -বার দুইয়েক পড়ে তার অর্থগত একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি।খটকা লাগল এখানে!

ভাবনা চিন্তা শুরু করলাম।প্রশ্ন উঠল-বাংলাতে কথা বললে মোটামুটি সবাই বোঝে। কিন্তু টেক্সটবুকসের লেখা শুনে বা পড়ে তারা বুঝতে পারছে না কেন?এর মাঝে ‘দর্শন’ সাবজেক্টটাতে আলাদা একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে।বন্ধুদের টেক্সটবুক পড়ি।চিন্তা-ভাবনার নানা সূত্রের ইঙ্গিত পাই।যার অনেক বিষয় আমি নিজে নিজেই ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছি।

উক্ত প্রশ্নটির উত্তর খুব কম দিনেই পেয়ে গেলাম।বলা চলে মুহুর্তেই।এখানে আরেকটি প্রশ্ন জোরালো হয়ে ওঠে তাহলো,

“কোন কিছু পড়ে বোঝা মানে কি?”

‘কোন কিছু’ মানে বইয়ে যেকোন বিষয়ের উপর ছাপার অক্ষরে নানা শব্দ নিয়ে গঠিত এক বা একাধিক বাক্য।এখানে দেখার বিষয় ‘কোন বিষয়ের

উপর কোন কিছু’ ব্যাপারটা কেমন?

—জানার নানা দিকের প্রকাশ। আর সেটা সবচেয়ে সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট ভাবে সম্ভব একমাত্র ভাষা দিয়ে।ভাষার মহাসাগরে বিচিত্র ভাবের শাব্দিক সঞ্চয়। অর্থাৎ শব্দগত দক্ষতাই কোন কিছু পড়ে বোঝার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

এভাবেই প্রথম উপলব্ধি করলাম ভাষায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব।

আর মাতৃভাষা হলো যে ভাষায় আমাদের পারিপার্শ্বিক নানা বিষয়ে চেতনার

পরিধি উন্মুক্ত হতে শুরু করেছিল।অর্থাৎ মা যে ভাষা দিয়ে পৃথিবীকে চিনিয়েছেন।উৎপত্তিগত স্তর থেকে উপলব্ধির জন্য এই ভাষায় প্রাধান্য পাবে এটাই সত্য।আর কোন কিছুকে তখনই বোঝা সম্ভব হয় যখন কিনা সেটা নিজের থেকেই আবিষ্কার করা যায়।নিজের থেকে আবিষ্কারের একটা অন্যতম দিক হলো, নিজের সাথে কথা বলা।আর নিজের সাথে আমরা মাতৃভাষাতেই কথা বলি।

আমার বন্ধুদের মূল সমস্যা কিন্তু আমি ধরে ফেললাম। বুঝলাম, মূলত ভাষাগত দক্ষতার পরিধি সীমিত হবার দরুন তাদের বৌদ্ধিক স্তরের এই থমকিত অবস্থা।কিন্তু তাদের জন্য আমার পরামর্শ ছিল,সামনে যতই পরীক্ষা থাকুক, এখন থেকেই তারা যেনো দুই একটা গল্পের বই বা ছড়ার বই পড়া শুরু করে।কিন্তু আমি জানি কেউই আমার সেই পরামর্শ মনে রাখে নি,মনে রাখে না!

কেনঃঅবিশ্বাসের পথে যাত্রা

এই টেকনিকটা সেই সব বন্ধুদের জন্য যারা অনেক কিছু সহজে মেনে নেন। তবে এটা যদি শেখেন একটা সমস্যা হবে আর কিছুই বিশ্বাস করতে পারবেন না।অন্তত প্রশ্ন ছাড়া কিছুই মানা সম্ভব হবে না আপনার পক্ষে।তার আগে একটা কথা বলে নিই, এই পদ্ধতি অনুসরণ করা শুরু করলে খুব কম দিনে আপনি সবখানে কেমন যেন আলাদা হয়ে যাবেন;বলা চলে, খানিকটা বেমানান হয়ে ওঠাবেন। আর এই অবস্থার স্বীকার হতে যদি রাজি থাকেন তবেই আপনি আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকুন। আমরা অসচেতন ভাবে অনেকবার হয়তো তাদের প্রয়োগও করেছি।চলুন দেখা যাক –

আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, আপনার চারপাশে এই মুহূর্তে অনেক ঘটনায় ঘটছে।দুটি ঘটনা বেছে নিন।এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দুটি ঘটনা,এদের ঘটার কি কোন কারণ আছে?

যেমন আমার কথাই বলি,আমার মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে আর সামনের তাল গাছটির অধিকাংশ পাতা সবুজ কিন্তু কয়েকটি সবুজ না,বিবর্ণ হয়ে গেছে।

এখানে এই দুটি ঘটার নিশ্চয়ই কারণ আছে।কি সেই কারণ?

আচ্ছা,‘কারণ’ মানে কি?(আগে এই নিয়ে একটু কাটাছেড়া করি)

ধরা যাক,আপনি কোন খাবারেরই স্বাদ ঠিক ভাবে পাচ্ছেন না।(ঘটনা-১)

আমাকে বললেন সেকথা।

১.‘কেন পাচ্ছেন না?’

বললেন, গতকাল রাতে গরম চা খেতে গিয়ে জিভ পুড়ে গেছে।(ঘটনা-২)

২.‘কেন পুড়ে গেছে?’

বললেন,জিভের কোশ গুলো চায়ের থেকে তাপ পেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে বোধহয়।(ঘটনা-৩)

৩.'কেন?'

এভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

এখন এখান থেকে দেখার বিষয় হল,ঘটনা-১ এর জন্য দায়ী ঘটনা-২ আর ঘটনা-২ এর জন্য দায়ী ঘটনা-৩।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি –

‘ঘটনা ঘটনা ঘটায়।’

অর্থাৎ ‘একটি ঘটনা’ ঘটার পিছনে ‘অন্য কোনো ঘটনা’ কাজ করে ।এই যে ‘অন্য কোন ঘটনা’ এটাই হলো কারণ।

আর এই 'কারণ' খোজার জন্য আমরা সচরাচর ‘কেন’ শব্দটি ব্যবহার করি।এখন প্রশ্ন হলো, কোন ঘটনার ‘কারণ’ খোজা বা ‘কেন’ প্রশ্নের উত্তর খোজা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এর জন্য বেশি না, গোয়েন্দা গল্প পড়লেই বোঝা যাবে এই ‘কেন'এর গুরুত্ব।যারা নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন তারা যদি রোগের কারণ ভাল ভাবে না জানতো তবে কি পারতো?

বলতে পারি কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান সেই ঘটনার গভীরতর রহস্য উদঘাটনের দিকে নিয়ে যায়,করে তোলে সাহসী,করে তোলে সচেতন। অর্থাৎ হয়ে ওঠি পার্থিব।

তাই মনের অলিন্দে সবসময় ‘কেন’কে জাগিয়ে রাখতে হবে।সব খানে ‘কেন’ ‘কেন’ করতে হবে।হোক তা হাজার হাজার বছরের পুরাতন কোন ধারনা বা সদ্য কোন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।আর যেই বা বলুক, যা কিছু।সব খানে ছুড়ে দিতে হবে ‘কেন’কে।যত ঘটনা (আবার বলছি যত ঘটনা) সব খানেই ‘কেন’কে আনতেই হবে।আর খুঁজতে হবে তার উত্তরও।যতক্ষণ পর্যন্ত না

সঠিক বলে মনে হয়।

শিক্ষক গণিতের ক্লাসে বলল, “মাইনাসে-মাইনাসে গুণ হলে প্লাস হয় আবার প্লাসে -মাইনাসে গুণ হলে মাইনাস হয়।”

আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে,”কেন হয়?”

কিংবা বইতে লেখা আছে যে, সব জাতীয় আধান পরস্পর কে বিকর্ষণ করে।আপনি প্রশ্ন তুলবেন,কেন তা করে?

কিংবা বাবা বলল, ভোর বেলার পড়া মনে থাকে। প্রশ্ন করে বসবেন—কেন?আসলে কি ঠিক?

আবার তুমি কোথাও পড়লে, গ্রন্থাগার আলো বাতাস যুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশ্ন তুলবেন কেন?

এখন কথা হচ্ছে প্রশ্ন তো করলেন, এর উত্তর?কিছুই করার নেই বন্ধু নিজেকেই খুঁজতে হবে।একটি কথা মনে রেখো—নিজে নিজে খুঁজে জানার আনন্দই আলাদা।তাছাড়া, তোমার এত প্রশ্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে বন্ধু।

কোচিং ব্যবস্থাঃসরকারি শিক্ষার মেরুদন্ডে আঘাত

পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা।আর এই পরিবর্তন আমরা সচেতনে হোক বা অবচেতনে হোক সবাইই কম-বেশী চাই।যদিও পরিবর্তনের অনেক দিক আছে। মূলত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক আর মনোদৈহিক ভাবে পরিবর্তনই অন্যান্য অনেক পরিবর্তনের কারণ।আর এই জন্যই মানুষের জন্য শিক্ষার আয়োজন।তবে ঠিক এই ব্যাপারটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কতটা গভীরবভাবে উপলব্ধি করে তা প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা,যদি তাদের উপলব্ধির পরিধি বিস্তৃত হত তবে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় যত অসংগতি আছে তত হয়তো থাকতো না।সেহেতু প্রশ্ন তুলতেই হচ্ছে।

শিক্ষা নিয়ে যারা একটু ভাবনা-চিন্তা করেন তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন,এখানে একজন শিক্ষিকা বা শিক্ষকের গুরুত্ব কতটা।শিক্ষা পণ্যের মত নয় যে তা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে।প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়-

“মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই।এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতাম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন,তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না।”

এটা যে কতটা ঠিক তা বুঝতে নিশ্চয়ই কারো অসুবিধা হবার কথা নয়।চারিদিকে জানার,নিজের বুদ্ধিকে উন্নত করার,আবেগকে সুন্দর করার এত এত উপাদান আছে যা সারা জীবন কিন্তু কেউ হাতে ধরে ধরে শেখাবে না।সেই প্রবাদটা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক :কাউকে একটা মাছ ধরে দাও, সে

একদিনেই খেয়ে ফেলবে কিন্তু তাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দাও সে প্রতিদিনই ধরে খেতে পারবে।

আর এটা যদি যৌক্তিকভাবে সঠিক হয়, তাহলে প্রশ্ন চলে আসে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেন তো?না অনেকেই ভাববার মতো সময় পান না?

ভাবতে গেলে সময় লাগে।কিন্তু যে শিক্ষিকা বা শিক্ষক স্কুল বা কলেজে যাবার আগে নিজের কোচিং চালাচ্ছেন আবার স্কুল থেকে এসেই শুরু করছেন। সে কি আদৌ কারোরই কথা ঠিকঠাক ভাবতে পারছেন?না পারছেন স্কুলের স্টুডেন্টদের নিয়ে সময় করে ভাবতে না পারছেন তার কোচিং বানিজ্যের ক্রেতাদের দিকে ঠিকঠাক নজর দিতে।আর তাতে করে হচ্ছে কি—যারা পিছনের তারা বরাবরই পিছনে থাকছে।কিন্তু অভিভাবিকা-অভিভাবক বলি আর ছাত্রী-ছাত্র বলি কেউই এমন ফাঁকি ধরতে পারছেন না।স্রোতে গা ভাসানোর আনন্দটাই আলাদা!

এবার যুক্তির খাতিরে আমি ধরে নিলাম,এক জন শিক্ষিকা-শিক্ষক তার স্কুলে কোন ফাঁকি দেন না, তার ছাত্রী-ছাত্রদের ব্যাপারে রীতিমতো ভাবনাচিন্তা করেন এবং কোনপ্রকার কোচিং বানিজ্যের সাথে যুক্ত নন।কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি ছাত্রী-ছাত্রদের সহযোগিতা নাও পেতে পারেন। কেননা, তার ছাত্রী-ছাত্ররা অন্য কারো অধীনে উক্ত সিলেবাসে পাঠ শেষ করছে।এতে করে দু'ধরনের কনসেপ্টচুয়াল ব্যাপার-স্যাপারে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।আর এই জন্য সে ক্লাসে মনোযোগী হতে পারে না।

আবার যদি ধরে নিই, কোনো কোচিং শিক্ষিকা-শিক্ষক তার ছাত্রী-ছাত্রদের নিয়ে ঠিকঠাক ভাবছেন,পঠন-পাঠনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগোচ্ছেন ।তাহলেও এক্ষেত্রে কি দাঁড়াবে?প্রথমত তার যে স্কুলে শিক্ষিকা-শিক্ষক আছে (যারা সরকারি বেতনপ্রাপ্ত)তাদের দায়িত্ব হয়তো কমে যাবে।আর যেহেতু কোচিং এ অভিভাবিকা-অভিভাবকরা অনেক অর্থ দিয়ে পড়াচ্ছেন, যেখানে কিনা দায়িত্বে নিয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার অবৈতনিক শিক্ষার।

সবমিলিয়ে শিক্ষাসিস্টেমেরই ধস আমরা দেখতে পারছি।

কোচিং এর পাশাপাশি সমান হারে আছে ব্যক্তিগত প্রাইভেট টিউশনি ব্যবস্থা।যেখানে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে ব্যাপারটা একেবারেই যায় না।"স্কুল(School)" ব্যাপারটার মধ্যেই আছে সমষ্টিগত সামাজিক ব্যাপার।কিন্তু প্রাইভেট টিউশনিতে যেটা একেবারেই দুর্লভ বলতে পারি।যেখানে মা-বাবার অযৌক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছারই প্রাধান্য বেশি।ছাত্রী-ছাত্রীদের মানসিক অবস্থা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা একেবারে মূল্যহীন বলা চলে।

তবে প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং এর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহল—যেহেতু স্কুল-কলেজে ঠিকঠাক পড়ালেখা হয় না সেহেতু বাধ্য হয়ে পড়াতেই হয়।এটা বোঝবার মত সচেতনতা যাদের আছেন তাদের নিশ্চয়ই এটা বোঝা উচিত গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের ইচ্ছায় অনেক কিছু ঘটতে পারে।তারা কেন সংঘটিত হচ্ছে না?কেন সমস্যাকে মেনে নিয়ে পুরো শিক্ষাসিস্টেমেরই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে?এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন, তা এখানে সাধারণ জনগণের কি করার?

তাদেরকে এটা বলতেই হচ্ছে,আপনি সরকারকে দোষ দিলে ভুলটি করবেন, কেননা সরকার কিন্তু আপনার দ্বারাই গঠিত হয়।অর্থাৎ আপনি বা আপনার মত অন্যদের দ্বারা।আপনার ছেলে মেয়ে শিক্ষা নামক গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে এভাবে বঞ্চিত হচ্ছে আর আপনি চুপটি করে মেনে নিচ্ছেন।আবার তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন।সেটা একটু কেমন কেমন হয়ে যাচ্ছে না?

আরেকটি প্রশ্ন অনেক করে বসেন,সরকারি ডাক্তাররা নিজেস্ব চেম্বার খুলে বসলে দোষ নেই,শিক্ষিকা-শিক্ষকরা কোচিং খুলে বসলে সমস্যা কোথায়?

ডাক্তারি করা আর শিক্ষকতা করা যে এক ব্যাপার নয় একটু চিন্তা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়।তবে আমি মাত্র কয়েকটি দিক তুলে ধরছি:

★ছাত্রী বা ছাত্রের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় শিক্ষিকা বা শিক্ষককে।যেখানে ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক বরং উলটো এবং খুব কম সময়ের ব্যাপার।

★ডাক্তারের প্রত্যেক রোগীকে অনেক ভাবে না চিনলেও চলে,কিন্তু একজন

শিক্ষিকা বা শিক্ষককে তার স্টুডেন্ট কে বুঝতে হয় খুব যত্ন করে।চিনতে হয় অনেক ভাবে।

মানুষের ভাবনাচিন্তার জন্য তার পারিপার্শ্বিকতা অনেকটা দায়ী।শিক্ষিকা-শিক্ষকদের,অভিভাবিকা-অভিভাবকদের,ছাত্রী-ছাত্রদের ভাবনা চিন্তাও তার পরিপার্শ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলে অধিকাংশ সময়।কিন্তু এটা মানতেই হবে উজান স্রোতের যাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক দিকেই যান।যদিও কেউ কেউ আবার ব্ল্যাকশিপ বলে থাকেন!

উন্নয়নের লেখচিত্র

আমাদের প্রজন্ম কি সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে ভাবতে শিখছে?একথায়,হ্যা কিংবা না বলে দিলে হয় তো হয়ে যেতো।কিন্তু তাতে করে অনুসন্ধান করা হতো না। আর যদি হতোও,তা কোন ভাবনার জন্ম দিতো না।অন্য আর পাঁচটি ব্যাপারের মতো এটাকেও পাশে রেখে এগিয়ে যাওয়া যেতো।কিন্তু আমরা দেখতে চাই, একটু বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নিতে চাই।

আবারো প্রশ্নটা করি,আমাদের প্রজন্ম কি সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শিখছে?

মানুষের সমাজ আছে।সেখানে আছে বহুবিধ সমস্যা।এখানে একটি বিষয় খুব প্রাসঙ্গিকই এসে পড়ে,তাহল,'সমস্যা মানে কি?' আসলে সমস্যা আপেক্ষিক। মৌলবাদ কারো কাছে সমস্যা আবার কারো কাছে সুবিধা। আবার রোগ-শোক রোগীর সমস্যা আবার কোন কোন ডাক্তারের পশার জমাবার রাস্তা।তবে আমরা এখানে 'সামাজিক সমস্যা' বলতে সেই ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করব যে সকল ঘটনা সার্বিক ভাবে মানুষের অগ্রগতিকে পিছিয়ে দেয়।অতীতে দিয়েছে কিংবা ভবিষ্যতেও দিবে যদি থেকে যায়।আর মানুষের অগ্রগতি বলতে মানুষের সার্বিক দিক দিয়ে শান্তির উত্তোরত্তর বৃদ্ধি বলে ভেবে নিতে পারি।

একসময় মানুষের কত সমস্যা ছিল!এখন সেগুলো নেই।আবার এখন যেগুলো আছে একসময় সেগুলো থাকবে না।এই যে এখন নেই —কেন নেই?সেই সমস্যাগুলো কিভাবে দূর হলো?এটা অবশ্য ঠিক কোনপ্রকার

অতিমানবিক বা ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান জাতীয় কেউ সেই সব সমস্যার সমাধান করে দেয় নি।তাহলে কী বা কারা করলো?ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেলে কারা সারে? ঘরগুলো, রেললাইন, রাস্তা, বাস —কারা বানায়?

এসব মামুলি প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে ভাবতে শেখাবে অন্যভাবে।অর্থাৎ সব সমস্যার সমাধান মানুষই করে।যদিও কল্পসুখী মানুষের আবার একটা জাতস্বভাব আছে নিজের থেকে শক্তিশালী কারো কাছে নিজেকে সপে দেওয়া।আর এতে তারা সুখীও বেশ।কিন্তু যদি সেই শক্তিশালীর অস্তিত্ব কল্পনায়ই শুধু হয় তবে তো আর কপালে কিছু জোটে না!তবুও মানুষ সুখী!

সুতরাং, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম যে,মানুষের সমাজে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান একমাত্র মানুষই করতে পারে।আর এখানেই চলে আসে আরেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—মানুষের এমন কি দক্ষতা আছে যার দ্বারা মানুষ তার সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারে?

আসলে মানুষ যদি বুঝতে পারে, কোন একটা ঘটনা আদৌ তার সমস্যা তবে তার সমাধানের যোগ্যতাও তার আছে।তাছাড়া,মানুষের শরীরের দীর্ঘ শারীরিক বিবর্তনই মানুষের দক্ষতা।আর মস্তিষ্ক কে আমরা বলতে পারি সেই দক্ষতার প্রধানতম অংশ।তথ্য যেখানে বিন্যাস্ত হয় অনেকভাবে। আর এই তথ্য নানা ভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। তথ্যের সুন্দর বিন্যাসের হাতিয়ার হল—শিক্ষণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ সমস্যার সমাধান করে থাকে।অর্থাৎ বলতেই পারি সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের শিক্ষায় জরুরী।

হয়তো এইজন্যই মানুষের জন্য গড়ে ওঠেছে শিক্ষা ব্যবস্থা।কিন্তু আমাদের প্রজন্ম কি সমস্যা নিয়ে ভাবছে শিখছে?ভাবছে তাদের সমাধান নিয়ে?তাই যদি হতো,তবে আমরা আমাদের বানানো অনেক প্রযুক্তি পেতাম,অনেক নতুন কৌশল পেতাম যা আমাদের নিজেদের মাথা ঘামানোর ফসল।আর তখনই বলতে পারতাম, আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে ভাবতে শিখছি।কিন্তু তা খুব কমই হচ্ছে।এর জন্য কি কি নিয়ামক দায়ী তা কিন্তু ভেবে দেখতে হবে।আমাদের সমস্যা নিয়ে কিন্তু আমাদেরকেই ভাবতে হবে,আর তবেই হয়তো সময়ের সাথে সাথে উন্নয়ন হবে এখনকার তুলনায় আরো বহুগুণে।

প্রচারমাধ্যম : যুক্তিবাদীদের একান্ত প্রয়োজন

অভিজিৎ মারা গেলেন!অনন্ত মারা গেলেন!টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও সবখানে খবর হল। অন্যান্য সোশাল মিডিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ল তারা। নানা ভাবে, নানা তথ্যে।কৌতুহলী জিজ্ঞাসা অনেকের, লেখালেখির জন্য মৃত্যু? কি এমন লিখেছেন? অনেকেই কিন্তু 'মুক্তমনা','ব্লগার' এমন শব্দের সাথে নতুন পরিচিত হলেন। আর তাদের লেখালেখিও পড়ে দেখার একটা ইচ্ছা জেগে রইল, অনেকে বিভিন্ন ভাবে পড়াও শুরু করলেন। হয়তো মুক্তমনা তখন পেয়েছিল অনেক কৌতুহলী মুখ।আজ যারা আলোকিত অনেকটাই।

আবার 'আমার দেশ ' পত্রিকা অনেক ব্লগারের লেখা সরাসরি পত্রিকায় ছাপিয়ে নানা ভাবে প্রচার করছিলেন। হয় তো অনেকেই তখন এই ব্লগারদের মৃত্যু চাইছিল।প্রথমত, তারা নাস্তিক, ধর্মের বিরুদ্ধে লেখে।আর ধর্ম বিরুদ্ধতাকে অত সহজেই কি মেনে নিতে পারে ধর্মের ভাইরাসে আক্রান্ত মস্তিষ্ক। তাই 'হত্যা'(যা কিনা আদিম বর্ববরতা) করাকেই সবচেয়ে সঠিক পথ ভেবেছিল অনেকেই।

এখন আমার প্রশ্ন হল,কোন কিছুর প্রচার সেই বিষয়ে আগ্রহ তৈরিতে কতটা দরকার?

হয়তো উপরিউক্ত দুটি বিষয় থেকে বেশ ভালোয় বুঝতে পারছি। শুধু তাই নয়, যে কোন একটা ঘটনা সংবাদপত্র /টেলিভিশন তুলে ধরুক পর পর কয়েকদিন দেখা যাবে অনেকের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে ব্যাপারটা। আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু সেখানে মূল প্রশ্ন নয়।

আমরা যদি আমাদের এখানে প্রচারিত টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখবো যে কয়েকটা সংবাদ চ্যানেল, ডিসকভারি ছাড়া বাকি সবগুলোই বিনোদন এবং ধর্মীয় বিষয়ই প্রচার করে।সরকারি চ্যানেলগুলো তবুও একটা মান থাকে। তবুও সেখানে ধর্মকে যেভাবে প্রোমোট করা হয়

তাতে অবাক হতেই হয়। তাছাড়া রাজনীতির কচড়া তো আছেই। জ্যোতিষীদের, আয়ুর্বেদের রমরমা প্রচারও দেখি প্রায়ই। তাছাড়া, সংবাদ চ্যানেল গুলোতে যেসব খবর প্রচারিত হয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেখানে অনেক সময় স্থান নাও পেতে পারে। সংবাদপত্রে শুধু বিনোদন তো আর চলে না। তবে বিনোদনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে বলতে পারি , দর্শক শ্রোতার, পাঠকের আগ্রহের দিকে তাকিয়ে সব কিছু সাজানো হয়। নইলে প্রত্যেক খবরের কাগজে খেলাধুলা, সিনেমা -সিরিয়াল সংবাদ প্রতিদিন নির্দিষ্ট পাতায় বেরোলেও বিজ্ঞান সংবাদ মাঝে মধ্যে এক আধটু আসে। টেলিভিশন, রেডিওর ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। মোট কথা বিজ্ঞানকে অপাঙক্তেয় রাখা হয়। কিন্তু কেন? আর এই বিজ্ঞানকে তুলে আনারই বা গুরুত্ব কতটা?

বিজ্ঞানের গুরুত্ব হয়তো আর নতুন করে না বললেও চলে। অথচ তার প্রচার প্রসারের ব্যাপারে এত অনিহার কারণ কি?

হ্যা,প্রথমত ভাবতে পারি, বিজ্ঞানের প্রচার করবে কারা? যারা করবে তাদের তো সেই মানসিকতা থাকা চাই। কিন্তু টেলিভিশন, সংবাদপত্রের কর্তাব্যক্তিরা এব্যাপারে কতটা সচেতন প্রশ্নটা সেইখানে।কিন্তু যারা বিজ্ঞান সচেতন, যুক্তিবাদ যাদের অস্ত্র তারা কি তাহলে বসে থাকবে? এখনো কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে কত কুসংস্কার সমাজের আনাচে কানাচে। শিক্ষা ব্যবস্থায় হাজারো ত্রুটি, আজ আমাদের প্রজন্ম বিজ্ঞানকে ব্যাবহার করে হয়ে ওঠছে বিজ্ঞানবিরোধী মানসিকতার। যারা বিজ্ঞান বোঝে, যারা যুক্তিবাদী তাদের কি কোন সামাজিক দায়িত্ব নেই যুক্তিবাদ প্রচারের, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের নেশায় মাতিয়ে তুলবার?

আছে বৈকি। বইয়ের মাধ্যমে বেশ ভালো প্রচার হয়। তবে বইয়ের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতেও কিন্তু দরকার এই প্রচার মাধ্যমের।

এটা ঠিক যে ফেসবুক, ব্লগে আমরা হয়তো যথেষ্ট এগিয়ে যুক্তিবাদের প্রচারে।কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের এখনো অনেকে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও তে প্রচারিত নানা বিষয়কে গুরুত্ব দেয় বেশী।

তাছাড়া বিজ্ঞান মনস্কতার হাতেখড়ি যে কিশোর বয়সে হয়, সেই সময়টাতে অনেকে ফেসবুক, ব্লগে যুক্ত থাকে না। সব মিলিয়ে যুক্তিবাদিদের এখন খুব প্রয়োজন সংবাদপত্র, টেলিভিশন –যার মাধ্যমে যুক্তিবাদের বহুবিধ দিক প্রচার-প্রসার সম্ভব হবে। সম্ভব হবে নতুন প্রজন্ম গড়ার পথে নবযাত্রা।এগিয়ে আসতে হবে বন্ধুদের। ভাবতে হবে কিছু করা যায় কিনা।

লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে না কেন?প্রশ্নটি বেশ চক্কর দিচ্ছিল মাথায়। নিজের চিন্তা থেকে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরলামঃ

১.আমরা যে বিদ্যালয়ে যাই সেই বিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকে। তাদের কথাবার্তা,

আদেশ-অনুরোধ, চাল-চলন আমাদেরকে প্রভাবিত করে। এবং অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে পারি আমাদের শিশুমন তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ ও করে।যদি এটা সত্যি হয়, তবে ধরতে পারি 'লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি' করার মত কোন উদ্দীপনা এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে আমরা পাই নি, পাচ্ছি না।

২.পরীক্ষা এবং তাতে প্রাপ্ত রেজাল্ট অভিমুখে যাত্রা আমাদের। অর্থাৎ আমরা কি পড়ব আর কি পড়ব না তা অনিবার্যভাবে নির্ধারিত হয় পরীক্ষাতে 'কি আসবে আর কি আসবে না' দিয়ে।সুতরাং বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যাচ্ছে লাইব্রেরীর বই না হলেও হচ্ছে!কেননা ক্লাসের ভালো ছাত্র কিংবা ছাত্রীরা তো লাইব্রেরীতে যাচ্ছে না।অথচ তারা দিব্যি রেজাল্ট করছে চমৎকার! আহা,কি চমৎকার!

৩.তথাকথিত প্রাইভেট টিউশনি 'পরীক্ষা লক্ষ্যে অভিযান'—এর আরেক ধাপ উচ্চ পর্যায়ের ট্রেনিং দেয়!(একবার ভেবে দেখা যাক তো, পরীক্ষা পাস করা বা ভালো রেজাল্টের যদি কোন উদ্দীপনা পনা না থাকতো তবে এই টিউশনি বা কোচিং ব্যবস্থার কি হতো?)।

ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের সময়টুকু দেবার আগে বা পরে থাকে এই 'উচ্চতর

পর্যায়ের সময়টুকু'!যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যাহত হয়।আর এখানে বসে লাইব্রেরী কথা ভাবা তো অশোভনই মনে হবে।

৪. তবে যে কথাটি না বললেই নয়, সেই কথাটিই বলছি।

আমরা তো অনবরত শিখি। সব জায়গা থেকে সব সময় শিখি। স্কুলের বাইরে আমাদের সামাজিক একটি পরিবেশ আছে। সেখানে আছে কিছু মূল্যবোধ, কিছু রীতিনীতি যা আমরা মেনে চলি। এই মূল্যবোধ আর রীতির অধিকাংশেরই উৎস ধর্ম। যা কিনা স্থিরতার চূড়ান্ত নিদর্শন। এই গুলোই আবার জন্ম দিয়েছে কিছু উৎসবের, যা কিনা আমাদের সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটায়। কিন্তু কয়লা ধূলে তো আর ময়লা যায় না। এর পরতে পরতে থেকে যায় অজ্ঞতার ছাপ, থেকে যায় স্থিরতার নিরেট আধার।আমাদের এই ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে 'বই পড়া' ব্যাপারটার মূল্য নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তা হল নিজ নিজ ধর্মের স্থির কিছু আকর পড়ার প্রতি নির্দেশ। যা কিনা মৌলবাদকেই তুলে ধরে।

নিজের সমালোচনা

সার্বিক দিক দিয়ে নিজের সমালোচনা(ভুল ধরতে পারা) করতে পারাটা আসলেই খুব কঠিন। প্রায়ই সময় আমরা নিজের পক্ষে থাকি। যাকে বলে 'আত্নপক্ষ সমর্থন' করা।একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়,নিজের ভুলগুলো ধরে নিজেকে পরিবর্তন করা যায় খুব দ্রুতই।কিন্তু প্রশ্ন যেটা, নিজেদের ভুল ধরা সহজ নয় কেন?

প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা স্বেচ্ছায় যা করি(সব ভুলগুলোও) সব কিছুতেই আমাদের সমর্থন থাকে আগে থেকেই।কিন্তু করার পর সেটা আমাদের উন্নতির নিয়ামক না হলেও নিজের করা কাজকে প্রশ্ন করে নিজেকে স্নায়ুপীড়ায় ফেলতে চাই না। অর্থাৎ কিছুটা দুঃখ পেতে চাই না।ফলত নিজের সমালোচনা আমরা করি না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অভ্যাস আমাদের সমগ্র জীবনযাপনে চলে আসে। আর আমরা এগোতে পারি না।উন্নতি আমাদের হয় না।

তাহলে আরেকটি প্রশ্ন,কিভাবে আমরা নিজেদের সমালোচনা করতে পারি?এখানে শুধুমাত্র একটি উপায় বলবঃ

নিজের সারা দিনের কাজগুলো তা লিখে ফেলা।

অর্থাৎ কি কি কাজ আপনি করেছেন তা লিখে ফেলা। এবার প্রতিটি কাজ এবং তার সময়ের উপর নানা প্রশ্ন তোলা উচিত।

যেমন:১.আজ এই কাজটি করার কতটা দরকার ছিল?

২.এই কাজটির সুদূর প্রভাব কি?

৩.এর থেকে কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আমি আজ করি নি?

৪.যত সময় নিয়ে কাজটি করলাম –তার কি দরকার ছিল?

এমন অনেক প্রশ্ন করতে হবে।

এটা ঠিক যে নিজেদেরকে ভালোবাসতে হবে।কিন্তু অতিরিক্ত ভালোবাসা যে আমাদের সামনে এগোতে দেবে না এ কথা ভুলে গেলেও চলবে না।

পরীক্ষাঃ কাদের জন্য

শিক্ষামহলে একটি সুন্দর সুপরিচিত শব্দের নাম 'পরীক্ষা'!অন্য ক্ষেত্রে যে নেই তা নয়,তবে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা মানে অনেক কিছু।নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরবার অথবা নিজেকে আরো ছোট ভাববার এক বিশেষ ব্যবস্থাই পরীক্ষা।এবং এই পরীক্ষা করে থাকেন আমাদের শিক্ষকেরা!

প্রশ্ন এসে যাচ্ছে,আমাদের শিক্ষকেরা আদৌ কী পরীক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন?নাকি গতানুগতিকতার আবহে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন? বা বোর্ডের নির্দেশনার জন্যে?সে যেই জন্যে হোক, বেঁচে থাকি আর মরে যাই, পরীক্ষা আমাদের দিতে হয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিতে হয়।কারণ তারা পড়ান!তাদের পড়ানো বিদ্যাই মাথায় নিয়ে আসে ছাত্র-ছাত্রী।কিন্তু প্রশ্ন হল,এই পরীক্ষাটা কাদের? ছাত্রছাত্রীদের? নাকি শিক্ষকদের?

আমি জানি,শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি নতুন কিছু নয়।তবে নিরাশ হবার কারণ এই জন্য যে,এই প্রশ্নের তাড়নায় খুব একটা বেশি উজ্জিবীত হতে দেখবেন না আমাদের শিক্ষকদের। তারা বরঞ্চ, এটা জানেন এবং খুব সহজ সমীকরণ —তারা যা পড়িয়েছেন তাইই পরীক্ষা নেবেন।তবে ব্যাপার হচ্ছে,যে মেয়েটি বা ছেলেটি তার দেওয়া বিদ্যা নিতে পারল না—তার জন্য কী হবে?শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কী করবেন তাদের জন্য?তিনি বেশ ভালো করে জানেন যে,ও ব্যাপারটি বুঝতে পারেন নি!তবুও তো ওই ছেলে বা মেয়েটিকে পরীক্ষা দিতে হবে!এবং মূল্যায়নের মরীচিকায় পড়ে যে নিজেস্ব সত্ত্বাকে পরিষ্কার দেখতে পাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার দায় কার?ওই শিক্ষার্থীর নাকি শিক্ষকের?

প্রশ্নটা বারবারই উঠে আসছে।মূলত,এই প্রশ্নটা করারা জন্যেই এই লেখা লিখতে বসা আমার।

এখানে আমার নিজের লেখা কবিতার কথা মনে পড়ছেঃ

দাদা,আমার শিক্ষকেরা আমাকে চেনেন না;

আমার নাম পর্যন্ত জানেন না!

এখন আমি দ্বাদশ ক্লাসে পড়ি,

পড়ার মতো কোনো প্রেরণা পাই নি কোনো দিন,

পড়তেও পারি না!

আমার কোনো শিক্ষক কোনোদিন একটু খবর নেয় নি।

বন্ধুদের মাঝে, বাড়ীতে আমি ভালো ছেলে নই মোটে!

অংক মিলত না,ইংরেজি উচ্চারিত হতো না!

আমি আমাকেই চিনতাম।

কিন্তু করার ছিল না কিছুই!

এখনো নেই!

এখনো আমার ভয় জমে আছে

দর্শনের যুক্তিতে,

পলিটিক্সের ম্যাটারে!

আর কিছুদিন বাদে পরীক্ষা আমার!

ভয়ে আছি!

দেখি কী হয়!!

এটা আসলে কবিতা নয়।একটা বাস্তবতাকে একটু তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র।ওই কবিতায় আমার মতোরা খুব একটা সামনের সারিতে আসতে পারে না!

শিক্ষকঃ ঘুরায় যারা প্রগতির চাকা

১.সে যত অসুবিধাই থাক শিক্ষকের আগ্রহ আর প্রচেষ্টার কাছে ওসব কিছু না। শিক্ষকের গুরুত্ব কোনো সময় কোন অংশে কম নয়।আধারের যাত্রাপথে তারাই আলো জ্বেলে দেয় ছোট্ট শিশুটির স্নায়ুর আঙ্গিনায়। তাদের উৎসাহ আর শ্রমে সভ্যতার চাকা অনেকটাই ঘুরেছে, ঘুরে যাবে চিরকাল।

২.ভাবলে অবাক হই, এই শিক্ষকদের ক্ষমতার কথা। বিস্ময়ে-উত্তেজনায় এক নবতর শক্তির স্ফুরণ জাগে ভিতরে ভিতরে। যত সব চিন্তা, যত সব সামাজিক ভাবনা কেমন যেন শিক্ষকদের নিয়ে নিয়ে আবর্তিত হতে চায়, হয়ও।আর নতুন সব চিন্তার হাতেখড়ি হয় অহরহ। কিন্তু সেগুলো আবার অন্যের শিক্ষাভাবনার সাথে মিলে যায়ও। তাতে করে একটু গর্ব ও হয়।আমিও চিন্তা করতে পারি!

৩.এখন আর যাই হোক ছেলে মেয়েকে স্কুলে দিতে চায় না এমন মা বাবা খুব কমই আছে। তবুও আছে। তবে সে জন্যও তারা দায়ী নয়।তাদের অসচেতনতা,নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহিত সিদ্ধান্তই এর জন্য দায়ী। তবে অধিকাংশ মা বাবা ছেলে মেয়েকে স্কুলে দেয়। আর এটা আইনও।

৪.আমরা আজ সমাজের চারপাশের ঘটে চলা নানা ঘটনায় হতবাক হয়ে যাই। বিশেষ করে নানা অপরাধমূলক কাজ কর্ম দেখে, মধ্যযুগীয় নানা বর্বরতা দেখে।নানা কুসংস্কারে আবদ্ধতা এখনো সমাজের প্রান্তে প্রান্তে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু মানুষের সমাজে মানুষের দ্বারাই সংগঠিত হয় এসব। কিন্তু বলতে পারি, আজ যেসব যুবক/যুবতী বা অন্য যারা এই সব অপরাধ করছে তারা অনেকেই স্কুলে গিয়েছে। মা বাবা তাদের স্কুলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা আজ এমন হল কেন?

৫.বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমাদের প্রগতির পক্ষে কতটা সহায়ক একটু চিন্তা

করলেই বোঝা যাবে। অথচ কেউ একজন বিরোধিতা করলে যুব সমাজের অনেকের রোষে পড়তে হবে তাকে। কিন্তু ঐ ছেলেরা স্কুল কলেজে এখনো পড়ে বা পড়ত। অথচ উন্নয়ন কিসে হয় বা সমাজের প্রকৃতপক্ষে কি কি কাজের প্রয়োজন তা বুঝে উঠতে পারে না।

৬.আজ নেতামন্ত্রীদের নিয়ে কত শত সমালোচনা। যেন যে ক্ষমতায় আসে সেই আমাদের দ্বারা সমালোচিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, তা হলে তারা নির্বাচিত হয় কি করে? কে ভালো, কে মন্দ তা ভোটারকেই বেছে ভোট দিতে হয়। তাহলে কি ভোটারা ভালো মন্দের তফাৎ করতে পারছেন না? কেন পারছেন না? অথচ তারাও তো স্কুল কলেজে পড়ত বা পড়ে?

৭.দুর্নীতি সম্পর্কে কে না জানে। কিন্তু বনের বাঘ আর গোয়ালের গরুরা এসে মানুষের সমাজে দুর্নীতি করে না। মানুষই করে। কিন্তু এই মানুষের তো অনেকেই স্কুল কলেজে পড়ত বা পড়েও কেউ কেউ?

৮.জন্মেই তো আর বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। কত শত কিছু জানার দরকার আছে। তার জন্য অন্তত স্কুলে তো যেতে হয়। আমরা বাঙালী তো স্কুলে যাচ্ছি হাজার হাজার, কলেজেও। কিন্তু সেই হিসাবে আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানী কোথায়?

৯.আইন মানার বা জানার তেমন কোন আগ্রহ দেখি না কারো মাঝে। অথচ আইনের দ্বারা কত কিছু হয়। কিন্তু আমরা তো স্কুলে গিয়েছিলাম সেই জন্য?

১০.বেকার তো কত জনে। কিন্তু স্কুলে এমন কি শিখলাম যে তারা দ্বারা করে খেতে পারব না?

খেয়াল করুন বন্ধু, একটু লক্ষ্য করুন।মা বাবা বুঝুক আর না বুঝুক স্কুলে দিয়েছিলো তো?কিন্তু সেই স্কুল নামক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়ে কেন আমাদের সমাজ এখনো এত এত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? ব্যর্থ করা? কিভাবে আসে এই ব্যর্থতা?অনেক অনেক প্রশ্ন তবুও থেকে যায়।

তবে এখন আর শিক্ষকদের দুর্দিন নেই। নিয়মিত বেতনেরও বন্দবস্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের।

উজ্জল ভবিষ্যতের সন্ধানে

আমার এক বন্ধুর সাথে সেদিন চাকরি-বাকরি কাজ-টাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল।বন্ধুটি খুব আত্নবিশ্বাসের সাথে বলল,"চাকরি আমি করবো না।" আমি জানি,অনেকেই এমন মন্তব্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলবে,"চাকরি যদি সে না পায় তো করবে কেমন করে?"

যদিও আমি নিজেই ওকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে সে আমাকে জানালো," আচ্ছা, অন্তু,যারা চাকরি করে, তারা কেনো করে বলতে পারো?"

আমি বললাম যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে।অনেকে অন্যের সেবা করার জন্য।আমার কথা সে মেনে নিয়েই বলল,"তথাকথিত চাকরি না করেও তো এই দুটো কাজ করা যায়।তাছাড়া তুমি যদি সত্যিই মানুষের সেবার জন্য কিছু করতে চাও তবে তোমাকে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত জরুরী।চাকরি করে সেটা হওয়া যায় যদিও কিন্তু তাতে একটা সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।তুমি যদি স্বাধীনতাতেই বিশ্বাসী হও তবে তোমাকে স্বাধীন ভাবে কিছু করা উচিত।যেখানে তুমি আর্থিক ভবে নিজের ক্রমাগত উন্নয়ন করতে পারবে।"

সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মগজে চাকরির বাষ্প এমন ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যে নিজেকে গোলাম করবার জন্য আমাদের দারুণ এক আনন্দ আছে।তাহলে প্রশ্ন ওঠে মানুষ কি তাহলে চাকরি করবে না?কেন করবে না? নিশ্চয়ই করবে।তবে যেখানেই থাকুক তার যদি সত্যিকারের কোনো স্বপ্ন থাকে তা যেনো তবে সেটা যেনো তার চাকরির দ্বারা পূর্ণ হবার পথে অগ্রসর হয়!

বন্ধুরা, আমার যুবক বন্ধুরা,এখানে কোনো উপদেশের ঝুড়ি নিয়ে আমি বসি নাই।কিংবা অযৌক্তিক কোনো মতবাদের প্রচার আমার লক্ষ্য নয়।আমি শুধু

বলতে চাই,নিজের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে চাকরির খোয়াড়ে বেধে না রেখে একটু ঝুকি নিয়ে কাজ শুরু করো।অবশ্য প্রথম দিকে যে কাজ শুরু করা হয় তার প্রতি শুধু ভালোবাসাটা যথেষ্ট। ধীরে ধীরে তুমি কাজ সম্পর্কে অনেক জানতে পারবে।তবে কাজের প্রতি মনের একান্ত টান যদি না থাকে তবে সে কাজে সফল হওয়াটা কতটা কঠিন তা তুমিও জানো, আমিও জানি!

আর এক রোগ আমাদের পেয়ে বসেছে।কামিনী রায়ের সেই কথা," পিছে লোকে কিছু বলে_"

লোকে কী সম্পর্কে বলে না,তা বলতে পারা মুসকিল।আর তথাকথিত তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের চাপে নিজেকে উপরে তুলবার যে পথ বেছে নিচ্ছ তা যেনো তোমার স্বপ্ন নির্মাণের পাথেয় হয়।যদিও চতুর্দিকে মোহনীয় অর্থ আনয়নকারী চাকরির ভিড়ে আমাদের অধিকংশের স্বপ্নগুলি লুটোপুটি খায়।কি আর করা আমাদের ইতিহাস আমাদের এই গোলামীর সাক্ষী!তবে তোমার স্বপ্নের সাথে যদি কোনো চাকরির কোনো সম্পর্ক করতে পারো তবে যাত্রা তোমার এখন থেকে শুরু হোক!

ঝুকি তোমাকে নিতে হবে ।জীবনটা অনেক ছোট।এই ছোট জীবনে আমাদের প্রতিটি দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কী সুন্দর দক্ষভাবে এক একটা দিন অবলীলায় কাটিয়ে দিচ্ছি।যদিও একটু ক্রিটিক্যালি ভাবলে, এই দিনটা থেকে আমরা আমাদের জন্যে সর্বোচ্চ সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারতাম।

সত্যি বলতে কী, আমরা আমাদের সময়ের বেশিরভাগটা ব্যয় করে ফেলি আমাদের ফেলে আসা অতীতে থেকে থেকে কিংবা ভবিষ্যতে যেয়ে যেয়ে।যদিও তাতে লাভ তেমন একটা হয় না।কেননা আমরা বেঁচে থাকি বর্তমানে।আমার বন্ধুরা, তাহলে তোমরাই সিদ্ধান্ত নাও প্রতিদিন তোমরা তোমাদেরকে দিয়ে কী কাজ করাবে। এবং খুব মন দিয়েই করবে।

সত্যি অবাক হতে হয়!আমাদের ব্রেণ খুব কর্মঠ হয়ে আমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিতে পারে!নিজের দায়িত্ব নিজেকে নিজেকে নিতে হবে।তোমার ভালোর কথা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র ভাবে।অধিকাংশই তোমার জন্য কিছু করতে পারে না।যে তোমার জন্য সত্যিকার অর্থে কিছু করতে পারে, সে হল

একমাত্র তুমি!তুমিই তোমাকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারো।যে কাজ ভালো লাগে ঝুকি নিয়েও সে কাজের পথেই যাত্রা শুরু করো।দেখবে ধীরে ধীরে তোমার ভিতর উদবেলিত হয়ে ওঠছে।নতুন নতুন পথ পেয়ে যাচ্ছো সামনে ওই স্বপ্নের গন্তব্যে যাবার।নিজেকে গোলাম করে,নিজের এত এত সম্ভবনা অপচয় কেনো করবে?

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির নির্মাণ

পৃথিবীর উপরে বসবাসরত বিভিন্ন জীব প্রজাতির মধ্যে মানুষেরাও আছে।অনেক সময় মানুষ নিজেকে অন্যের সাথে মিলাতে পারুক আর না পারুক সেও অন্য জীবের মতোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে।জোটবদ্ধতা কোনো কোনো প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। মানুষেরও।সেই থেকে সমাজ।নানা জৈবিক বৈশিষ্ট্য আর অস্তিত্ত্বের জন্যেই মানুষের এই জোটবদ্ধতা।ধীরে ধীরে অনুভূতির নানান দিকে মানুষের পদার্পণ ঘটেছে।বিচিত্র ভাবে কত-শত কাজে তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কখনো জৈবিক প্রয়োজনে, কখনও সামাজিক কিংবা নিছক নান্দনিকতার জন্যেও মানুষ নিজেকে নানান কর্মে যুক্ত রেখেছে।মানুষের এই কর্ম দক্ষতা ধীরে ধীরে আরো বর্ধিত হয়েছে। এগিয়ে নিয়েছে সমাজকে।অনুভূতিও পালটে দিয়েছে ধীরে ধীরে। তৈরী হয়েছে নানা প্রয়োজনবোধ। আর এভাবেই এগিয়েছে সমাজ।এখনো সেই সামাজিক প্রয়োজনেই মানুষ নিজেকে নিয়ে এই সমাজের মধ্য রেখেই এগিয়ে চলেছে অবিরাম।

কিন্তু একটা সত্য হল,আমাদের পৃথিবীতে নানান সমাজ বিদ্যমান। এখানেই একটা প্রশ্ন করে নেওয়া যাক, সমাজের এই ভিন্নতা কেন?অর্থাৎ সামান্য আঞ্চলিক পার্থক্যেও সমাজের মধ্যে ভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করি।এটা কেন?এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবতে গেলেও গভীরতায় প্রবেশের আনন্দ পাওয়া যায়।এর জন্যে আমাদেরকে প্রতিটি সমাজের ইতিহাস খুজতে হবে। কয়েকটি মৌলিক দিকে নজর রেখে এগোতে হবে।প্রথমত খাদ্যসংগ্রহ, আত্নরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি-এই তিনটি বিষয়ের দিকে চোখ রেখে প্রতিটি সমাজের উত্থান বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো, সামাজিক ভিন্নতার পিছনে এগুলো নিয়ামক হিসেবে আছে।

ধীরে ধীরে মানুষ সেই গুহা থেকে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।এর পিছনে তার শারীরিক গঠন তথা উন্নত স্নায়ুতন্ত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।মূলত নতুন

পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেবার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এই মানুষ প্রজাতির।আর এর জন্যই বোধহয় আমাদেরকে যে সমাজে যে সময়ে জন্ম নিই না কেন,আমাদেরকে সামাজিক হয়ে ওঠতে হয়।

সমাজের এই ভিন্নতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল,সমাজের মানুষের জীবনযাপন।জীবনযাপন কে আমরা আমাদের মতো করে বলতে পারি,'জীবনকে অতিবাহিত করা'। এবং সত্যি হলো,আমরা সবাই তাই!অর্থাৎ জীবনযাপন করছি।কিন্তু আমাদের জীবনযাপনে ভিন্নতা আছে।আমরা এখন এই পার্থক্যের কারণগুলোই খোজার চেষ্টা চালাবো।আগেই দেখেছি,খাদ্যসংগ্রহ,আত্নরক্ষা, বংশবৃদ্ধি আমাদের জীবনযাপনে প্রভাব ফেলে।তাছাড়া আছে,আমাদের নানান বিষয়ে জ্ঞানের ভিন্নতা।যা কিনা, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।অর্থাৎ যাকে মেনে নিয়ে আমরা নানান সামাজিক কাজ করে থাকি।আর একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে,আমাদের অনেক সামাজিক আচারণের পিছনে নানান 'বিশ্বাস' কাজ করছে।এবং অদ্ভুত ব্যাপার হল,এক এক সমাজে এক এক ধরণের বিশ্বাস প্রচলিত।যেহেতু আমরা সেই সমাজেরই,চোখমুখ খোলা রাখলে আমরা নানান সমাজের নানান বিশ্বাস খুজে নিতে পারি।যে ভিন্নতা আমরা দেখতে পাই,নানান ধর্মীয় কার্যাবলীতে।একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করা সত্ত্বেও নিছক বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে আমাদের মধ্যে কত ব্যবধান।তাহলে আমরা এটা নিশ্চিত বুঝতে পারলাম আমাদের জীবন যাপনে নানান 'বিশ্বাস' এক অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে।

তারপর আরেকটি দিক হচ্ছে, ভাষা। ভাষাও আমাদের সামাজিক জীবনযাপনের অংশ।আমরা খুব অবাক হয়ে খেয়াল করতে পারি এই ভাষার ভিন্নতা।এবং এই ভাষার মধ্য দিয়েই আমাদের চিন্তাচেতনার প্রকাশ হয়ে থাকে।

তাহলে আমরা দেখলাম যে, আমাদের জীবন যাপনে অনেক অংশ জুড়ে বস্তুগত নানা উপাদান থাকলেও মূলে রয়েছে অবস্তুগত বিভিন্ন কিছু।যার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের জ্ঞানচর্চা।বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে,কিংবা কোনো বিষয়ে আমাদের পূর্বানুমান কী হবে।আর

এই সব কিছুকেই বলতে পারি সংস্কৃতি।ইংরেজিতে বলা হয়-কালচার(Culture)। এই সংস্কৃতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে Nicki Lisa Cole বলেছেন,

"It is important for shaping social relationships, maintaining and challenging social order, determining how we make sense of the world and our place in it, and in shaping our everyday actions and experiences in society. "

তাছাড়া আমরা যদি আমাদের সামাজিক আচারণের দিকে লক্ষ্য করি দেখবো,প্রায় অধিকাংশ আচারণ পদ্ধতিই আমাদের সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।এবং এই জন্য সংস্কৃতি আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জেনারেলাইজড দৃষ্টিভঙ্গির অধিকাংশই আমাদের সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। এবং এখান থেকেই আমরা আমাদের মূল বিষয়ে প্রবেশ করবো!

যেহেতু আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেহেতু আমাদেরকে এখন দেখতে হবে আমাদের সংস্কৃতি কী এখনো সেই অর্থে অগ্রগামী।নাকি নানান বিশ্বাস আর বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছে।যাকে ছেড়ে দিতে পারছে না কেউ।যদি সেই অর্থে অগ্রগামী না হয় বরং আমাদেরকে পদে পদে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।অনুভূতিতে শান্তির আনয়ন করছে না।আর আনলেও তাতে রয়েছে বিকৃতি।তাহলে তো সেই সংস্কৃতিকে প্রশ্ন করাই যেতে পারে।আমরা এখন আমাদের এই সংস্কৃতি চর্চার দিকে চোখ ফেরাবো।একটু দেখার চেষ্টা করবো আমাদের এই জীবনযাপন কি আরো উন্নত হতে পারে না?বা দৃষ্টিভঙ্গির কি আর কোনো পরিবর্তন হতে পারে না?

যা কিছু আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করে সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিচ্ছি তাকে পালটিয়ে এমন এক সংস্কৃতি কী নির্মাণ করা যায় না,যে সংস্কৃতিতে আমাদের আচারণগুলোতে থাকবে যুক্তির ছোয়া,থাকবে বিজ্ঞানমনস্কতা।আর তবেই হয়তো এখনো সমাজের কোণে কোণে যে সব সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে তা দূর হবে।

উপরে যে এত প্রশ্ন করে ফেললাম,তার উত্তরে একটাই কথা বলব-আমরা

পারি সেই সংস্কৃতি নির্মাণ করতে। যাকে বলতে পারি বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি।এখন প্রশ্ন হল, সেই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি কিভাবে নির্মাণ সম্ভব?আর তা যদি সম্ভব হয়,তাহলে আমরা সব দিক দিয়ে পালটে যাবো।এবং আমরা নিশ্চিত ভাবে ভরসা করে বলতে পারবো,আমরা বিপদগ্রস্থ হবো না।কেননা,আমরা যে বাস-ট্রেন কিংবা উড়োজাহজে প্রত্যহ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করছি তা কিন্তু পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপরই দাঁড়িয়ে।অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের উপর আস্থা রাখতেই হচ্ছে আমাদেরকে।কেননা,বৈজ্ঞানিকজ্ঞান তার পদ্ধতির মধ্যেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করেছে।তাহলে আমরা আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণেও কেন বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রাখবো।কিন্তু সেই আগের প্রশ্নেই এখন ফিরে যাই,কিভাবে আমাদের সেই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি নির্মিত হতে পারে?

চিন্তাভাবনা করলে অনেক পথ বেরিয়ে আসবে এটা নিশ্চিত।তবে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি নির্মাণের কাজ যে শুরু হয় নি তা কিন্তু নয়।আমাদের স্কুল-কলেজগুলোর অবস্থান সেই দিক দিয়ে এক অনন্য স্থানে।কেননা,স্কুল-কলেজে মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে।এখানে আমিও স্কুল কলেজ কেন্দ্রিক একটা পদ্ধতির কথা তুলে ধরবো যে পথে অগ্রসর হলে আমরা হয়তো আগামী দিনে একটা সুন্দর বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারবো।

এখন আসা যাক আমাদের সমাজে।সমাজের প্রান্তে প্রান্তে স্কুল।কলেজও।এখানে মূলত জ্ঞানের চর্চা হয়,মানব সম্পদকে ধীরে ধীরে ব্যবহারযোগ্য গড়ে তোলা হয় বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়নের মাধ্যমে।যেখানে আবেগিক(Affective) শিক্ষণ ও চলে। তবে পরিকল্পিতভাবে না।আর সংস্কৃতির এক বিশাল হাতিয়ার হল,আবেগ।শিশুরা ছোট বেলাতেই স্কুলে আসে।আমি আমার নিজেস্ব একটি পথ-যার সন্ধান আমি নিজেই করেছি তাই এখানে বলিঃ

১)প্রথমত,আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।অর্থাৎ যারা কিনা মনে করেন,আসলেই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি নির্মাণ জরুরী।এবং তাদের প্রথম পয়েন্ট হবে,তাদের মতো আরো অনেক

শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরি করা বা খোজ করা।আমি এখানে বলতে চাইছি,আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা যদি বিজ্ঞান মনস্ক না হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা হবে না এটা নিশ্চিত।

[বিজ্ঞানমনস্কতা হল সব ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ। এর জন্য বিজ্ঞান পড়ার দরকার নেই।এটা যে কেউ নিজের বৈশিষ্ট্যে ধারন করতে পারে]

২)উক্ত বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের শ্রেণীকক্ষে তাদের নিজেস্ব বিষয় অনুযায়ী শিক্ষা দেবার সময় উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নানা ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছাত্রছাত্রীদের শেখাবেন।এবং তাদেরকে এটা বলে দিতে হবে,কিভাবে যে কোনো ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা যায়।তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তাদেরকে তুলনামূলক পদ্ধতি এগোনোর কথা বলা যেতে পারে।যেমন-একদল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আরেক দল অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে।

৩)তারমানে এটা দাড়াল যে, শিশুরা যেনো ছোট বেলা থেকেই এটা বোঝে তার চারপাশে ঘটে চলা প্রতিটি ঘটনার কারণ আছে।সে জানুক আর না জানুক।তার বয়স-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকে সেই ঘটনাগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪)প্রচলিত বিভিন্ন কথা, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই,তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

৫)এভাবে শিশু ধীরে ধীরে সব ঘটনা ব্যাখ্যা করতে শিখবে।তার চারপাশে নানান ঘটনার ব্যাখ্যা আরো সুক্ষ্ণ সুক্ষ্ণ ঘটনার কারণ খুজতে সাহস জোগাবে।

৬)তবে এই ঘটনা কখনোই বস্তুগত নয়।বরং বেশি বেশি ব্যাখ্যা করতে হবে সামাজিক নানা ঘটনা।সামাজিক ঘটনাও শিশুকে খুব বেশি প্রভাবিত করে।শিশু কেন-সবাইকেই।

আমার মনে হয় এভাবে আরো কিছু পদক্ষেপ নিলে আমরা বৈজ্ঞানিক

সংস্কৃতি খুব শিগ্রই নির্মাণ করতে পারবো।এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের ভুমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা সম্ভব।আর স্কুল কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা যে কতটা তা হয়তো সবারই জানা আছে।তবে সত্য হল,এখনো আমাদের সেখানে পৌছানোর জন্য অনেক পথ হাটতে হবে।অনেক পথ।তবে আমরা আমাদের প্রজন্মের জন্য নির্মাণ করে যেতে পারবো নতুন এক সমাজ।যার আড়ালে বিজ্ঞান কথা বলতে থাকবে শুধু।

ধর্মীয় উৎসবঃ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যর্থতা

[এখন পূজোর এই সময়ে এই আশা নিয়ে এটা কিন্তু লিখছি না, বেশ অনেকেই পড়বেন।জানি,হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র পড়বেন কিংবা কেউই পড়বেন না। তবে ব্যাপারটা তা নয়, নিজেস্ব কিছু চিন্তা লেখার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক মনে করছি।তাই লিখছি]

বারবার নানা ধর্মীয় উৎসব এসে কড়া নাড়ে দরজায়।মেতে ওঠে ধর্মাবলম্বী জনতা।বছর বছর এটাই চলতে থাকে।শিশুরা জন্ম নেয়,শিখে নেয় তারাও।আজ যারা পূজা পালনের মূল উদ্যোক্তা কিংবা ঈদ উদযাপন কমিটির সভাপতি একসময় তারাও শিশু ছিল।কিছুই জানতো না; না জানতো কথা বলতে, না পারতো হাটতে —ধীরে ধীরে শিখেছে সব। শিখেছে নিজেস্ব ধর্মের রেওয়াজ নীতি।ধীরে ধীরে আকড়ে ধরেছে।কেউ কেউ জীবিকাও পেয়ে গেছে এখানে;নিপাট ব্যাবসাও জমিয়ে ফেলেছে অনেকেই।

এখানে যে কথাটি বলার জন্য এত গৌরচন্দ্রিকা তা বলেই দিচ্ছি,আসলে এই সব 'অলীক কিছুর উপর মেতে ওঠা' কতটা ঠিক?প্রশ্নটা শুনে প্রায়ই শোনা প্রশ্নই মনে হবে। কিন্তু প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ।মানুষ হাটি হাটি পা পা করে যুক্তির প্রসারের মাধ্যমে অনেক দূর এগিয়েছে।অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়া যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না তা মানুষ বুঝে গেছে।তাছাড়া যারা একটু জানে শোনে তারা সেই কারণও খুজতে শিখে গেছে।কিন্তু যেটা সত্য সবখানে যুক্তি খোজার প্রবণতা এখনো সেই ভাবে তৈরি হয় নি।যে গণিত যুক্তি ছাড়া এক পা ও এগোতে পারে না,সেই গণিতের শিক্ষক যদি হাতে আংটি বা সরস্বতী মায়ের বন্দনায় মেতে ওঠেন তাহলে কি বলতে হবে?তার কাছে এমন কি গাণিতিক যুক্তি আছে যার দ্বারা তিনি এটা করছেন?কিংবা ইতিহাসের শিক্ষক হয়ে কিভাবে একজন কোনো ইতিহাস না জেনেই কোনরূপ প্রথাতেই গা ভাসিয়ে দেন?

এখানে একটি কথা উঠে আসবে 'নিজেস্ব এলাকার বাইরে যাবার সাহস, অধিকাংশেরই নেই।'এবং তাদের অধিকাংশই এটা মনে করেন যে, তার দরকারও নেই।

একজন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে কি দরকার আছে দূর্গাপূজার অতীত খোজার কিংবা সরস্বতী পূজা নিয়ে প্রশ্ন তোলার?এই 'নিজেস্ব এলাকার বাইরে যাওয়া আর না যাওয়া ব্যাপারটা 'অনেকের কাছে খুব গোলমেলে। ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক।সত্যি কথা হল,প্রয়োগবুদ্ধির সীমাবদ্ধতা তৈরি করে নেওয়া।হয়তো তা কেউ করে দিয়েছে নয়তো সে নিজে নিজে করেছে।বিজ্ঞানের যুক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই বললেই চলে।অর্থাৎ, একটা ঘটনার কারণ দুইভাবে ব্যাখ্যা করলে দুটোই হুবহু ঠিক হবে—এটা ঠিক নয়।যুক্তিকে একই হতে হবে।

কেউ যদি জলে ডুবে মারা যায় -বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কথা বলবেএবং যার দৌড় যতদূর সে ততোদূর পর্যন্তই বলবে।অনেকেই বলবে,ভূতে ঠেসেও মারতে পারে!

তবে একজন পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের ছাত্রও ভূতে ঠাসা তত্ত্ব অনায়াসে মেনে নিতে পারে।আর মেনে নিলে সমাজের চোখে তার কোনো সমস্যা হয় না বরং তার প্রভাবটা একটু বেড়ে যায়।বিশেষতঃ তার মতো শিক্ষিত লোক যখন ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছে! তখন অন্য সবাই মানবে না এটা হতে পারে কি?ঠিক যেন,ডাক্তারবাবু রোগীর জীবনকে শেষমেশ উপরাল্লাহর উপর দেওয়ার মতো ব্যাপারটা।কিন্তু ডাক্তার যে যুক্তি প্রয়োগের এই জায়গাটায় গ্রামের অন্য সবার মতো রয়ে গেছে!

এই যে 'দূর্গাপূজা' —এতে তো হাজার হাজার বিজ্ঞান পড়ুয়া,বিজ্ঞানের শিক্ষক -শিক্ষিকা মেতে ওঠবেন। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের মতোই। তারা কি তাদের নিজেস্ব সাবজেক্টের যুক্তি থেকেই এই পূজার কোনো যথার্থ খোজার চেষ্টা করেন?দুই একজন করেন। কিন্তু তাতে যা ওঠে আসে তাহল,উৎসবের আনন্দ!

ঠিক আছে।উৎসব চাইলে মানুষ নতুন করে গড়তে পারে।রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন করে তো দেখিয়েছেন।তাছাড়া নিছক আনন্দ পাবার জন্য,এভাবে

যুক্তিহীন ধারনা(বিশ্বাসের)র উপর কিভাবে থাকা যায়?বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি বলবেন?আপনারা কি ব্যর্থ নন?এটা কি আপনাদের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছে না?কথা ছিলো তো,

যুক্তিবোধ সম্পন্ন নাগরিক করে গড়ে তুলবার।কিন্তু এমন অযৌক্তিক ধর্মীয় আচারণে আপনাদের মেতে থাকা দেখে হতাশাই প্রকাশ করতে হয়।

অনেকে বলবেন -সবাই তো মাতছেন। আমাদের মাতলে ক্ষতি কি?ক্ষতি কিছুই নয়।কথা হচ্ছে,আপনার যুক্তি নিয়ে।

যদি আপনি এসবের বিরোধীই হন,তবে কেনো আপনার মতোদের নিয়ে একটা সুন্দর বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির জন্ম দেওয়ার কথা ভাবছেন না?সংগঠিত হচ্ছেন না?

বিজ্ঞান শিক্ষাঃপ্রসঙ্গ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছুটি

আমাদের স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষাকে আমার কাছে মাঝে মাঝে তামাশা মনে হয়।জানি না আপনার কি মনে হয়!কেন? বলছি সে কথা।

বিজ্ঞানশিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে চিন্তা করতে শেখানো। যেখানে যুক্তিই আসল কথা।আমি এখানে বলে রাখছি,যুক্তি কিন্তু ইতিহাসেও আছে,দর্শনেও।অথচ অবাক বিস্ময় একশ্রেণীর শিক্ষকদের (যারা তথাকথিত বিজ্ঞানের শিক্ষক)দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলো কোন বিষয়ই না। হাস্যকর তাদের কাছে।যেটা সঞ্চারিত তাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও।যাক সে কথা, আমি যা বোঝাতে চাইছি তাহল,প্রত্যেকটি সাবজেক্টই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হ্যা,এটা হতেই পারে সেগুলোর এগোনোর পদ্ধতিতে কম-বেশি ভিন্নতা থাকতেই পারে।তাই বলে,সেগুলো যে বিজ্ঞান নয় তা কিন্তু নয়।আসলে যারা পদার্থবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কোনপ্রকার মিল দেখে না, এটা কিন্তু সাবজেক্টদ্বয়ের দোষ নয়,সমস্যাটা হল তাদের চিন্তায়।আসলে তারা ভাবতেই পারে না,বৈজ্ঞানিক যুক্তি সব খানে সচল।সেই হিসাবে আমরা বলতেই পারি,স্কুল-কলেজের শিক্ষামাত্রই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।অনেক বলবেন, বাংলা আর ইংরেজি –এ দুটো তো ভাষা! এর ভিতরে বিজ্ঞান পেলেন কোথায়?আমি তাকে প্রশ্ন করব,'ভাষাবিজ্ঞান'নামক শব্দটি কি আপনি কখনো শুনেছেন?তাহলে আমরা বলতেই পারি, বৈজ্ঞানিক পথই গভীর থেকে গভীরতর জানার পরীক্ষিত পদ্ধতি এবং এই কারণেই শিক্ষা সিস্টেমে এটি সামগ্রিক ভাবে কার্যকরী।

তাহলে? আমার প্রশ্নটি এখনই।তাই যদি হবে,তাহলে অবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুকে প্রশ্রয় দিয়ে স্কুল কলেজ বন্ধের আয়োজন কেন?এটা ঠিক ছুটির দরকার আছে।কিন্তু দূর্গার দশটি হাত কেন–এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক কোন উত্তর না পেয়ে বিজ্ঞানের টিচার্সরা অন্তত কিভাবে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে

ছুটিকে উপভোগ করে এটি আমার মাথায় আসে না?প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমার ঐ একই কথা।যার আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই অথচ কি সুন্দর ছুটির আয়োজন!ভাবতে গেলে, তামাশাই মনে হয়!

ছুটির দরকার আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সে ছুটি হোক,অন্যরকম।

বিজ্ঞানচেতনাঃ জেগে উঠুক জনপদ

বিজ্ঞানের চর্চা মানেই কিন্তু আগাগোড়া যুক্তিবাদের চর্চা করা।আপনি শিহরিত হবেন,একটি বিজ্ঞানের বই হাতে নিলে।যেখানে থরে থরে সাজানো নির্দিষ্ট বিষয়ে কত রহস্যের উন্মুক্ততা। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না কোন কিছুই। সব কিছুকেই পরীক্ষা করবেন। পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিবেন।আর মজা হল,উক্ত সিদ্ধান্তও আপনি পাল্টাতে পারবেন যদি আপনার হাতে তা পাল্টানোর মতো তথ্য-উপাত্ত থাকে।

আপনি এখানে, এই বিজ্ঞানের রাজ্যে, কোন ভাবেই বন্দি নন।এখানে আপনি মুক্ত,আপনার চিন্তাও মুক্ত।কল্পনার অবাধ স্বাধীনতাও আছে। তবে তার গ্রহণযোগ্যতা তখনই আসবে যখন আপনি যুক্তি দিয়ে দেখাতে পারবেন এটা ঠিক।আর এটাও ঠিক যে,আপনি ভাবতেই পারেন, বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানীদের জন্য,আমার মতোদের জন্য নয়।সত্যি সত্যিই যদি এটা আপনার ধারনা হয়,তবে সম্ভবত আপনি ভুলের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন।আর বিজ্ঞান চর্চার আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে অনেক অসুখের মুখোমুখি হচ্ছেন।তবে আপনার এই ধারনাকে কেন আমি বোকামি বলছি –তা এবার শুনুনঃ

সত্যি বলতে কি কমবেশি বিজ্ঞানের চর্চা আমরা সবাই করি।তা হোক সচেতন ভাবে আর অসচেতন ভাবে।তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসচেতনবভাবেই করি।তবে এখানে একটি কথা বলে ফেলা যাক।বিজ্ঞান কি? আর বিজ্ঞানচর্চাই বা কি?আসলে বিজ্ঞান হল বিশেষ পদ্ধতিতে কোন কিছু সম্পর্কে জানা তথ্য।যেখানে,পরীক্ষা (Experiment) খুব দরকারী। আর যেটা দরকার তাহল যুক্তি।বিশেষত গাণিতিক। তবে এটা কখনও স্থির কোন সিদ্ধান্ত দেয় না,কোন বিষয়ে পর্যবেক্ষিত সত্য প্রকাশ করে। আর বিজ্ঞানের এই নড়ন-চড়ন বৈশিষ্ট্যই এক শ্রেণীর মানুষের বিজ্ঞান নিয়ে যত সমালোচনার কারণ।অথচ তারা জানে না যে, তাদের স্নায়ুতন্ত্রে(মনের) খবরাখবর নিয়েও বিজ্ঞান কাজ

করছে। আর তাদের ঐ রুপ সংকীর্ণ গন্ডিবদ্ধ চিন্তার সীমারেখারও জটাজাল ভেদ করে ফেলেছে।

হায়,যারে তুমি নিচে রাখতে চাইছো, সেই তোমারে নিচে টানছে!রীতিমত হাস্যকর।

যা বলছিলাম,পরীক্ষা করে দেখার মানসিকতা যাদের আছে, পথে ঘাটে চলতি জীবনে যারা সহজে কিছু মেনে নেয় না,শোনা কথা এমন কি চোখে দেখা কিছুকেও প্রশ্নের মুখোমুখি করে রাখে তারাই সাধারণত বিজ্ঞানের চর্চাকারী।অর্থাৎ গতিশীলতায় যাদের আস্থা,স্থবিরতায় নয়।যদিও এই ধরনের লোকজন আমাদের সমাজে এখনও খুব একটা দেখা যায় না।কেননা,সমাজের সমাজের সার্বিক অবস্থা এখনো প্রশ্নকারীকে চিনতে পারি নি।উপলব্ধি করতে পারে নি তার গুরুত্ব কতখানি।এর বোধহয় বড় কারণ সমাজের মানুষের নিজের অতীত আর বর্তমানের যোগসূত্র না খোঁজার মানসিকতা।এটা কোন কালেই ছিল না।তবে অদূর ভবিষ্যতে হবে এটা আশা করাই যায়।কিন্তু নিজের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস জানায় আমাদের এই অনীহা কেন?

আসলে জানার আনন্দেই এখানে নেই।আর কেউ যদি একটু জানতে চায়ও তাকে এমন সব অভিধায় ভূষিত করে খানিকটা একলা করে রাখা হয় যে, একসময় তার মনে হয়,আমি বোধহয় ঠিক পথে নেই।অন্যরাই ঠিক।

আমি আগেও হয় তো বলেছি,বারবারই বলি,গলদ কিন্তু শিক্ষায়।ছেলেমেয়েদের সামনে পরীক্ষায় নাম্বারের মূলো যে কিভাবে আর কবে থেকে কেনই বা ঝুলতে শুরু করেছিল তা পরবর্তী কোন লেখায় তুলে ধরার ইচ্ছা থাকল।

তবে আপনাদের আবারো বলছি,শিক্ষা যতদিন না পরীক্ষা পাশের বদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে ততদিনে স্বপ্নের সোনার তরীর কল্পনা আর কাঠালের আমসত্ত্ব বানানো একই ব্যাপারই থাকবে।

বিজ্ঞানচেতনায় ভরে উঠুক জনপদ।

বিজ্ঞান পড়ুয়া

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাদের অগ্রসর হবার কথা ছিল,তারা যদি অবৈজ্ঞানিক ধারনাকে ঠিক মনে করে তার পক্ষে সওয়াল করে কিংবা জীবনধারনে একান্ত নিবিড় করে নেয় তখন সন্দেহটা আরো জোরালো হয়-

আদৌ কি তারা বিজ্ঞান শিখছে?

'বিজ্ঞান শেখা'—এই কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার হবার দরকার।সবার আগে যে বিষয়টি উঠে আসে তাহল প্রশ্ন করতে শেখা।আর এই কাজটি কিন্তু সব শিশুরাই ছোটবেলা থেকে শুরু করে।চারপাশে অজানা কত কিছু তার।ভোরের সূর্য, রাতের তারা,গাছেদের পাতা,উড়ন্ত এরোপ্লেন,মাছেদের খেলা করা, আকাশের মেঘ,পাখিদের ডাক—কত শত কিছুতে সাড়া দেয় তাদের মন।আর প্রশ্ন করে বসে অবলীলায়।বিজ্ঞান শেখায় ঠিক শিশুর মত প্রশ্ন করা দারুণ কার্যকরী এবং খুব প্রয়োজনীয়।কিন্তু আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় কি হয় তা দেখা যাক—

এটা প্রায় সবাই অবগত যে শিশুরা প্রশ্ন করে। একটা শিশুর প্রশ্ন করাকে আমাদের সমাজে কিন্তু খুব একটা বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।যদিও স্বাভাবিক কিন্তু এর মূল্য যে কত তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়রা বোঝে না। তাছাড়া তাদের এমন অনেক প্রশ্ন আছে যা মা বাবাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।আর উক্ত শিশুর বই(যদি ইতিমধ্যে বই পড়া শুরু করে থাকে) বহির্ভূত বেশিরভাগ প্রশ্নকে অনেক মা-বাবাই মনে করে অহেতুক ।এই সব কারণে তারা শিশুর প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে শিশুর প্রশ্ন করার মানসিকতা হারিয়ে যায় ।আস্তে আস্তে নিরুত্তাপ হয়ে আসে তাদের জিজ্ঞাসু চোখ।

আর আরো বড় ক্ষতি করে আমাদের স্কুল গুলো। এখান থেকেও অধিকাংশ শিশুরা প্রশ্ন করে চরম অবহেলার স্বীকার হন এবং খুব কম দিনেই প্রশ্নের বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়।কি অপূর্ব সুন্দর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা!তবে এটা

ঠিক আমরা কেউ ক্লান্ত নই।সব কিছু মেনে নিয়ে চলতে দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি সকলে!আর এই প্রশ্ন বিমুখদের অনেকেই এক সময় বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা ছাত্রী হয়।আর এরাই এক সময় প্রশ্নের তীব্র বিরোধিতা করে ।মনে করে পরীক্ষার জন্য এত সব জানার বেশী দরকার নেই।যদি কেউ ক্লাসের ভিতর কোন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে গভীর কোন প্রশ্ন করে তবে এতে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।যেন এটা ওদের কোন প্রয়োজনই নেই। আসলে যখন প্রয়োজন ছিল তখন এদের উত্তর দেওয়ার মত সহানুভূতি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি।আর এখন ওরা প্রশ্নের উত্তর না পেয়েও হাসি-আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারছে।

তবে এটা ঠিক যে আমরা আমাদের ধারনা কিন্তু (যে কোন ব্যাপারে)ঠিক গড়ে নিবোই।হোক সে বৈজ্ঞানিকভাবে কিংবা বিশ্বাসের নানা জটাজালে।অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যগুলো হয়ে থাকে বিশ্বাসজাত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিকৃত।আর প্রায় সকলেই তথ্যগুলোকে পরীক্ষা করে দেখার মত সুযোগ পায় না।কিংবা সুযোগ পেলেও ইচ্ছা না থাকার দরুন দেখে না।অবলীলায় মেনে নেয়। হয়ে ওঠে বিশ্বাসী।আর বিশ্বাস জিনিস টা দারুণ শক্ত,একবার গড়ে ওঠলে তা ভেঙ্গে ফেলানো অতটা সহজ হয় না।অথচ শুধু কিছু প্রশ্ন আর সংশয় রেখে দিলে বিশ্বাসের মতো ব্যাপারটা গড়ে ওঠতে পারে না।ফলে মুক্ত থাকা যায়।তবে আমাদের সমাজে বিশেষত ধর্মে প্রশ্ন করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে নানা নীতিকথার(!) ছলে।

আর এই মেনে নেওয়া ব্যাপারটায় কি বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা ইতিহাসের ছাত্রী -সবাই বেশ পটু।সেই ছোট বেলা থেকে দেখে আসা,শুনে আসা, বলে আসা, বুঝে আসা -ব্যাপারগুলো ভুল হতেই পারে না।আর যদি কেউ ভুল বলে তাকে বাইরে ফেলে রাখি। কেননা সবাই যে কথা বলে, যে পথে চলে –সে বলে ওল্টো কথা,চলে ওল্টো পথে।তাকে সমাজবিচ্ছিন্ন করতে আমাদের জুড়ি নেই।অথচ শুধুমাত্র মেনে না নিয়ে প্রশ্ন করাটাই তার অপরাধ!অর্থাৎ আমাদের সমাজ আসলে কি চায় সেটা বোঝা মুসকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদিকে চাইছে বিজ্ঞানী , অন্যদিকে চাইছে ধর্ম পালনকারী,বিশ্বাসীগোষ্টি।সম্ভবত এই জন্য আমাদের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের আজকে এই অবস্থা।জীবনের সব খানে

যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে এগোতে হবে তা কিন্তু আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকারা অবগত নয়। আর ছাত্র-ছাত্রীদের দোষারোপ করে কি লাভ?

তারা শুধু এটুকুই জানে ক্লাসের বইগুলো আর কিছু বাইরের বই নিয়ে থাকলেই হচ্ছে।কিন্তু ঈশ্বর আছে কি নেই কিংবা মাটির প্রতিমা আসলে কিছু নাকি—এসব প্রশ্নের উত্তর খোজা বিজ্ঞানের কাজ নয়।

তবে এটা যে কতটা ভুল তা বোঝাই যাচ্ছে,বিজ্ঞানই তো আমাদের যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনছে।যেখানে অসুখকে একসময় দেব-দেবীর অভিশাপ মনে করা হত,এখন অনেকেই জানে এসব অনেক ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার জন্য।এখন অপেক্ষায় আছি,কবে আমাদের শিক্ষার্থী সমাজ বিজ্ঞানকে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে নতুন করে দেখতে শিখবে?

প্রসঙ্গঃপাঠ্যবই

১

ইদানীং কেন জানি না মনে হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত টেক্সটবুকের চাপ কমিয়ে বেশি বেশি বিজ্ঞান ও সমাজের উপর সাহিত্যে পাঠে ছেলেমেয়েদের অভ্যস্ত করে তোলাটা জরুরী।আর গুরুত্ব দিতে হবে ভাষার প্রতি।তা হবে —গাণিতিক এবং মাতৃভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষা।এতে করে, ছেলেমেয়েদের চিন্তার প্রসার হবে।মাধ্যমিক লেভেল অব্দি অনেক কিছু সাধারণ ভাবে খাওয়ানোর যে চেষ্টা চলছে তা রীতিমত ভাবনার উদ্রেক করে।তার চেয়ে সাহিত্যের আনন্দ উপভোগ করাই ভালো।এক পর্যায়ে সব কিছুর সাহিত্য পড়তে পড়তে নির্দিষ্ট বিষয়ে তার আগ্রহ জন্মিয়ে যাবে তখন না হয় আলাদা ভাবে পড়ানো যাবে।তবে আবারো বলছি,গণিতটাকে কিন্তু চর্চায় রাখতেই হবে।কেননা,প্রকৃতিকে সুক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করার হাতিয়ার এই গণিত।

"শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধের প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা আজও কত প্রাসঙ্গিকঃ

"পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।

কেহ-বা মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারি পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্‌গতি হয় না।

অতএব কমিটি-নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; "সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।"

২

শিক্ষার্থীরা কি কি পড়বে তার নির্দিষ্ট তালিকাকে পাঠ্যক্রম বলতে পারি। অধিকাংশ শিক্ষক/শিক্ষিকা তাদের শ্রেণীতে পাঠদানের ক্ষেত্রে ওই পাঠ্যক্রমই অনুসরণ করে থাকেন।অর্থাৎ একটা নির্দেশনা দেওয়া থাকে,যা থেকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা বুঝতে পারেন -কি পড়াবেন আর কি পড়াবেন না।কিন্তু আমার প্রশ্ন হল,

আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই পাঠ্যক্রম কতটা উপলব্ধি করতে পারে?ধরা যাক,একজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা।ক্লাস 11 এর তার বাংলা ক্লাস।তিনি সচরাচর কি করেন?

প্রথমত সিলেবাস দেখেন এবং সেই অনুযায়ী পড়ান।কিন্তু প্রশ্ন এখানে,তিনি সিলেবাসে যে যে বিষয়গুলো পড়ানোর নির্দেশনা পেলেন তা কি, তার নিজের উপলব্ধিতে আনতে পারলেন?অর্থাৎ তিনি কি বুঝতে পারলেন,

উক্ত বিষয়গুলো কেনো সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত? কেনই বা ছেলেমেয়েদের তা পড়াতে হবে?

নাকি, শুধু সিলেবাসে আছে বলে পড়িয়ে সারলেন।

প্রশ্নটা আমি তুললাম, এই কারণে যে, আমার কেমন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে হয়, নিতান্ত সিলেবাসে আছে বলে স্যারেরা কোনো বিষয় পড়ান। না থাকলে পড়াতেন না।

অর্থাৎ সিলেবাস বুঝে ওঠে নি তারা।কেন ইতিহাসের সিলেবাসে সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগ আসল?তা কেনই বা শিক্ষার্থীদের জানা দরকার?

এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট (দর্শনভিত্তিক) কোনো উত্তর আমাদের স্যারেদের কাছে সচরাচর থাকে কি?কিংবা গণিতের ক্ষেত্রে দ্বিঘাত সমীকরণের ধরনাগুলো কেনো নির্দিষ্ট ক্লাসেই দেওয়া শুরু হল কেন?আমাদের স্যারেরা,আসলে কি এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন?আবার ইংরেজীতে কম্প্রিহেনশন বা প্যারাগ্রাফ লেখার দরকার পড়ল কেন?

আমি জানি,এসব প্রশ্নের উত্তর যে কেউই কম বেশি দিতে পারবে।কিন্তু উত্তর শুনলে কিংবা তার পাঠদানের কৌশল দেখলে বোঝা যাবে—আদৌ অনেকেই উত্তরগুলো উপলব্ধি করেন নি? বা এমন তর প্রশ্নও তাদের কোনো দিন নাড়া দিই নি।কেননা,প্রথা মানায় আলাদা একটা সুখ আছে।প্রশ্ন করলেই সেই সুখ বিনষ্ট হয়!

৩

রবি ঠাকুরের একথা বোধহয় অনেকেই শুনেছে-

"হে অতীত,

তুমি ভূবনে ভূবনে

কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।"

অনেকে অনেকভাবে এ কথার মানে ব্যাখ্যা করবেন। আমার কাছে সবচেয়ে অবাক লাগে বিগত সালে পার করে যেসকল ছাত্রছাত্রী নতুন ক্লাসে উঠল তাদেরকে।সেই দলে আমিও পড়ে গিয়েছি এবং যাই!যাইহোক,অবাক লাগার প্রসঙ্গেই বলি।এটা হয়তো বুঝতে বাকী থাকে না পাঠ্যবই প্রণেতাদের একটা নির্দিষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ও

শিক্ষাবৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে।সেই জন্য বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন কিছু পড়ানো হয়।আপাতত দৃষ্টিতে তাতে হয়তো কোনো সমস্যা নেই।কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়ে যায় তখনই,

যখন কিনা ক্লাসগুলোর জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু একজন ছেলে বা মেয়ে ঠিকঠাক আত্নস্থ না করে বা একেবারেই না জেনে উপরের ক্লাসে উঠে যায়।অনেক এখানে পাশ ফেলের ব্যবস্থার কথা টানবেন,এখানে বলে রাখি যারা পাশ করছে তাদেরই বা উক্ত বিষয়বস্তু কতটা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ।

আসলে এবিষয় লেখার ব্যাপারটা কেমন যেন হঠাৎ মাথায় এলো।ধরা যাক,ক্লাস টেনের একটা স্টুডেন্টের কথা।যে কিনা তার পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো ঠিকঠাক না পড়ে বা না জেনে টেনে ওঠে গেছে।এখন কথা হচ্ছে,আপনি ভালো শিক্ষক।আপনি চান তাকে এমন ভাবে সাহায্য করতে যেনো সে আরো ভালো হয়।প্রথমেই আপনি লক্ষ্য করবেন,আগের ক্লাসগুলোর পড়া তার ক্লিয়ার নেই।তখন আপনি কি করবেন?আগের ক্লাসগুলো পড়িয়ে আসবেন?

তাই যদি করেন, তাহলে তো সময় পাবেন না ওর ক্লাসের বই পড়াবার।আর যদি ওর সিলেবাসই পড়ান তাহলে কিভাবে এগোবেন?ওকে যা বলবেন তার অনেক কিছু এমনই যেখানে মেনেই নেওয়া হয় সে আগের বেশ কিছু শিখে এসেছে।কিন্তু আদৌ সে শেখে নি।এই মূহুর্তে সে কি করবে?

আচ্ছা,একটা পরীক্ষা করলে মনে হয় বেশ কাজ দেবে,

ক্লাস টেনের ১০ জন স্টুডেন্টকে যদি ক্লাস সেভেনের একটা প্রশ্ন সেটের উত্তর করতে দেওয়া হয় —কি ঘটবে?

এখানে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে,আমি কিন্তু সাধারণভাবে ক্লাসের প্রথম সারির স্টুডেন্টদের কথা বলছি না।তারা তো হাতে গোনা কয়েকজন।এখন প্রশ্ন যেটা,তাহলে এখানে এই ব্যার্থতার দায় কাদের?শিক্ষার্থীদের? শিক্ষক-শিক্ষিকাদের?অভিভাবকদের?

প্রশ্নের কাঠগড়ায়

মুক্তচিন্তা খুব জুরুরী।অহরহ চিন্তার কত আঙ্গিক চারিদিক।সেখানে একটিকে অবলম্বন করে চলতে গেলে বেধে যেতে হবে। যেমনঃ কেউ মার্ক্সবাদী, কেউ গান্ধীবাদী,কেউ আম্বেদকরবাদী,কেউ বুদ্ধের অনুসারী, কেউবা আবার গোড়া ধার্মিক।প্রত্যেকেই নিজেদের ওয়েটাকে সঠিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত।কিন্তু প্রশ্ন হলো কোনটা ঠিক?এই ক্ষেত্রে মনকে খোলা না রাখলে বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু কিভাবে মনকে খোলা বা যে কোন পূর্বধারণা (assumption) থেকে মুক্ত রাখা যায়?আর এক্ষেত্রে আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা কতটুকু?

★

পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ নির্ভর তথ্যই বিজ্ঞান।তবে গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত কোন সম্পর্কও বিজ্ঞান।

আমাদের স্কুল-কলেজেও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।কিন্তু আমার প্রশ্ন হলোঃ

১.আমাদের কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে নিজেদের শিক্ষণে তার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করেন?

২.বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে বা পড়ছে এমন কত জনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে?

৩.ছাত্রছাত্রীরা কি বিজ্ঞান নিয়ে পড়ায় আগ্রহী হচ্ছে বা কোন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে?

৪.বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস কি শিক্ষার্থীরা জানতে পারছে?

৫.বিজ্ঞান কি শুধু প্রযুক্তিগত বিষয়াবলীতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে?

৬. মানুষের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যায়, নানা অলৌকিক ঘটনায় (যেগুলো মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম দেয়) ছাত্রছাত্রীরা কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে?নাকি নিজেরাও বিশ্বাসের এক একটা স্তম্ভ হয়ে ওঠছে?

★

১.তথাকথিত খারাপ ছাত্র/ছাত্রীর মনস্তত্ত্ব (মনের খবর বা অবস্থা)কয় জন শিক্ষক/শিক্ষিকা বোঝেন?কেন তারা পিছন বেঞ্চিতে বসতে চায়? প্রশ্ন করতে চায় না?

২.শিক্ষার্থীদের খারাপ রেজাল্ট করাটাতে ব্যর্থতা কাদের—শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নাকি ছাত্রছাত্রীদের?অনেকে বলেন —উভয়েরই। কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা কি স্বীকার করেন?আর তা করলেও,নিজেদের কোন উন্নয়নের কথা ভাবেন?

৩.যে সব শিক্ষক/শিক্ষিকারা প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং এর সাথে যুক্ত তারা কি তাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পান?কিভাবে তাদের ডেভেলপ করে যায় তা নিয়ে ভাবেন?নাকি নিজেদের টিউশনি ব্যবসাতে মশগুল থাকেন?

৪.ক্লাসের ফার্স্ট বা সেকেন্ড বয় বা গার্ল ও কেনো একাধিক টিউশনি নেয়?

৫.প্রাইভেট টিউশনির আসল উদ্দেশ্য কি —পরীক্ষাতে পাশ করানো বা ভালো নাম্বার পাওয়ানো নাকি ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধন?

১.একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছিঃ

একদল শিশুদের পদার্থবিজ্ঞানী এবং আরেকদল শিশুদের জীববিজ্ঞানী

হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে গেলাম।

প্রশ্ন হল,আমার উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হবে?হলে, কেন হবে?নাহলে, কেন হবে না?

২.বিজ্ঞান, আর্টস বা কমার্স -এই ভাবে শ্রেণীবিভাগের দরকার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল,যারা তা নিচ্ছে তারা কতটা তাদের প্রবণতার নিরিখে নিচ্ছে এবং কতটা পূর্ববর্তী শ্রেণীতে প্রাপ্ত মার্কসের নিরিখে নিচ্ছে?

৩.'বিজ্ঞান'ব্যাপারটাতে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?স্বচ্ছ তো?

৪.আমাদের স্কুল কলেজের উদ্দেশ্য যে কি তা ভাবতে গেলে একটু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।একদিকে বিজ্ঞানের কত কিছুর পাঠদান অন্যদিকে কোন ধর্মীয় উৎসব এলেই ছুটির মহড়া। কি চায় আমাদের স্কুলগুলো? বিজ্ঞান সংস্কৃতির বিকাশ নাকি প্রথাগুলোকে আগলে আরামে আয়েসে দিনগুলো চলতে?

৪.ব্যবহারিক আর থিওরিক্যাল -এই দুটো আলাদা কিছু নয়।কিন্তু আমাদের স্কুল-কলেজে এমন ভাবে দুটোকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে দুটোকেই মনে হয় ভিন্ন কিছু।আসলে এরা হাত ধরাধরি করে এগোয়। কিন্তু প্রশ্ন হল,আমরা এমন আলাদা ভাবে দেখি কেন?

ডিফারেন্স

কলেজে এসে সেদিন প্রথম করলাম বাংলা ক্লাস।কেন জানি না,মনটা খুলে খুলে যাচ্ছিল!মনে হচ্ছিল,বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতায় হাপিয়ে উঠা প্রাণটা মুক্ত বাতাস সেবন করছে!ট্রেন ধরাটা জরুরী ছিল।কিন্তু তার থেকেও জরুরী মনে হচ্ছিল ক্লাসটা!অনেকে এই ঘটনার অন্যরকম মানে করবেন।বিশেষত, সায়েন্স পড়ুয়া বন্ধুরা কেউ কেউ নাক সিটকাবেন।অনেকে আবার বলবেন,আমি সাহিত্য ভালোবাসি। আর তাতে করে বাংলা ক্লাসে আকর্ষণ বোধ করবো এটাই তো স্বাভাবিক।কিন্তু না বন্ধু,বিজ্ঞান আমার প্রিয়।আর সাহিত্য আর বিজ্ঞানের মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাই না।যেখানে পার্থক্য দেখতে পাই, সেখানেই কৃত্রিমতাটা যেন বেশি বেশি চোখে পড়ে।প্রমথ চৌধুরির একটি কথা খুব মনে পড়ছে,"দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।"

সাহিত্যের গঙ্গাতে স্নান করাটা আমার বিজ্ঞান পড়ুয়া বন্ধুরা প্রায় ভুলতে বসেছে এবং সেই সাথে সমান ভাবে অবহেলা করতে শিখেছে আর্টসের নানন্দিকতা![আসলে আমার নিজেস্ব কিছু অভিজ্ঞতা এবং তার ভিত্তিতে কিছু চিন্তাই এই প্রবন্ধের মূল প্রেরণা।দুই এক জন সাহিত্যপ্রেমীরা আছেন আমার দলে]যাই হোক, বিজ্ঞান পড়ুয়াদের সাহিত্যচর্চা নিয়ে মোটামুটি কথা হবে কিছুক্ষণ। সাথে থাকবেন আশা করি।

প্রথমে আসা যাক, সাহিত্য আর সাহিত্যচর্চা বলতে কি বুঝি?

এ বড়ো জোরালো প্রশ্ন এবং সব থেকে অবাক করার বিষয় হল অধিকাংশেরই এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা নেই।আর থাকবেই বা কী করে।সেইভাবে কেউ তো আর আমাদের শেখায় নি বা শেখার তেমন কোনো

রাস্তাও পাই নি।ফলে জানার ওদিকটা অন্ধকারই থেকে গেছে।আমরা এখন একটা আইডিয়া অর্জনের চেষ্টা চালাবো এখানে।

কাজী মোতাহার হোসেনের কয়েকটি অভিমত দেখে নিই,"‘ভাত না খেলে তীব্র দুঃখ অনুভূত হয়, কিন্তু খেলে গভীর আনন্দ পাওয়া যায় না। একটা সুন্দর সনেট না পড়লে দুঃখ নেই, কিন্তু পড়লে খুশিতে মন ভরে ওঠে। দৈনিক পত্রিকা না পড়লে দিনটা মাটি হলো বলে মনে হয়, কিন্তু পড়লে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। একটা ভালো সাহিত্যের বই না পড়লেও চলে, কিন্তু পড়লে মন আনন্দে নেচে ওঠে-জীবনকে সার্থক বলে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছে হয়।"বন্ধুরা হয়তো এখান থেকেই সাহিত্য কী তার একটা আচ পেতে পারেন।আসলে সাহিত্য মানে মানুষের সৃষ্টি লিখিত কিছু যেখানে মানুষ তার সেন্স ব্যবহার করে যা কিছু জেনেছে বা কল্পনা করে যা কিছু তুলে ধরেছে!আর সাহিত্যচর্চা মানে শুধু লেখা নয়,যে সাহিত্য পড়ে সেও সাহিত্যচর্চা করে!কিন্তু আমাদের সমাজে ব্যাপারটি ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে!

ডা লুৎফর রহমান তার উন্নত জীবন বইয়ের 'জাতির উত্থান' নামক নিবন্ধে একেবারে প্রথম দিকে একটা প্রশ্ন তুলেছেন,"মানুষকে শক্তিশালী, বড় এবং উন্নত করে তোলার উপায় কি?"

এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন,"এই পথ আর কিছু নয়-দেশের বা জাতির সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা।যে সমাজে সাহিত্যের কোনো আদর নেই, সে সমাজ বর্বর সমাজ।কথা কাগজে ধরে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নামই সাহিত্যসেবা।.....এই কথার ধারা গান ও গল্প,কখনও কবিতা ও দর্শন, কখনও প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের রুপ নিয়ে মানুষের সম্মুখে রঙিন হয়,মধুরভাবে দেখা দেয়।

দুর্গত কণ্টকাকীর্ণ আঁধার পথে কেউ যদি প্রদীপ না নিয়ে চলতে কিংবা আলোর যে আবশ্যিকতা আছে একথা উপহাসের সঙ্গে অস্বীকার করে,তাহলে তাকে কী বলা যায়?কোনো জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার বা অবহেলার চোখে দেখে উন্নত হতে চেষ্টা করলে সে জাতি আদৌ উন্নত হবে না।"

সত্যি বলতে কি, বোধহয়,এখানেই আমরা থেমে গেছি।আজ আর সাহিত্যে আমরা মজা পাই না।ফল আমাদের উন্নতি ডিগডিগিয়ে চলা।এটা ঠিক যে গরুর গাড়ী এখন আর চড়ি না।তবে মগজটা ঠিক গরুর গাড়ীই চড়ছে।যতোই ঝা চকচকে বেশভূষা, কথাবার্তায় ইংরেজি আনি না কেনো, আমরা আসলে মর্ডানাইজ নয় অনুকরণশীল হয়ে বেশ আছি এবং মনে করছি সুখে আছি।

এতক্ষণ 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যকুল 'ছিলাম।এবার একটু যুক্তির কথা হোক।আসলে সত্যিই তো,সাহিত্য তো সবই।

হে বিজ্ঞানের ছাত্র তোমার বইগুলো যারা লিখছে আমি নিশ্চিত তাদের ভিতরে সাহিত্যপ্রতিভা প্রগাঢ় ভাবে আছে এবং তারা নিজেদেরকে লেখক হিসাবেই গর্ববোধ করে।তবে তোমার সমস্যা কোথায়?সাহিত্যের প্রতি তোমার টানের তবে এতো অভাব কেনো?হতে পারে তুমি এতোদিন বঞ্চিত ছিলে কিন্তু এখন যখন বুঝেছো তখন সাহিত্যচর্চা শুরু হোক বন্ধু!

বের হোক একটা বিজ্ঞানের পত্রিকা।লেখো সেখানে ভিন গ্রহের মাটি নিয়ে,সুদূর আমাজন মহাবনের গাছ কিংবা কোন প্রাণীর জীবন-রহস্য নিয়ে।কিংবা সপ্তাহে সপ্তাহে বিজ্ঞান আলোচনা হোক না তোমার কলেজ কক্ষে।হতে পারে তোমার শিক্ষকেরা এসব ভুলে গেছে,তবে তোমরা ভুললে চলবে কেনো?বিজ্ঞানের প্রতি টান কি এমনিতেই বাড়বে। গড়ে উঠুক না বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি!তোমাদের কথা বার্তায় বিজ্ঞান আন্দোলনও আসুক ঠিক কঠিন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মতন!

ড. বি.আর. আম্বেদকর এবং সংরক্ষণ প্রসঙ্গ

আম্বেদকরের নাম শুনলে কারো কারো ভ্রু কুচকে যায়। জাতপাত আর আম্বেদকর তাদের কাছে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ । তারা মনে করে ভারতের এখনো জাতপাত প্রথা বিদ্যমান থাকার জন্য আম্বেদকরই দায়ী। সংরক্ষণ প্রথা তো তারই সৃষ্টি।এই ধারনা তাদের কীভাবে গড়ে ওঠল তা সন্ধানের দরকার আছে। যদিও আমি সে দিকটাতে আপাতত যাচ্ছি না। আমি এখন আমার নিজেস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আম্বেদকরকে দেখছি এখানে।

প্রথম যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল, জাতপাত কি আদৌ কোন সমস্যা? অর্থাৎ একটি দেশের অগ্রগতিতে জাতপাত কি বাধা হয়ে দাঁড়ায়? একটু ভাবলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি এটি একটি সমস্যা হয় তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কিভাবে সৃষ্টি হল এই জাতপাত ? ইতিহাসই সে উত্তর দিবে। কিন্তু এই ইতিহাস পেতে গেলে অবশ্যই নানা ঘটনার নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ভারতে এখন জাতপাত কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। কিন্তু ঘটে চলা নানা ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় হাজার বছরের এই প্রথা ৬০/৭০ বছরে এখনো নানা ভাবে কখনো আড়ালে আবডালে, কখনো প্রকাশ্যে নিজেকে জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এর জন্য দায়ী কারা? যারা জাতপাত মেনে নিজেদের সবসময় উচ্চে রাখতে চায় তারা, না কি যারা অন্যের বিধানের কবলে পড়ে জন্মেই নিচু জাত হয়ে গেছে? ভেবে দেখার দরকার আছে।কিন্তু প্রশ্ন হল এর থেকে মুক্তির উপায়? মাথায় রাখতে হবে, হাজার বছরের প্রথা কিন্তু।

আমরা জানি, একটি সমস্যাকে যত গভীর ভাবে অনুভব করা যায়, দার্শনিক স্তর তথা উৎপত্তিগত স্তর থেকে বোঝা যায় তত তার সমাধানের সম্ভাবনা বাড়ে। গণিত সম্পর্কে যাদের একটু ধারনা আছে তারা বেশ বুঝবেন। গণিতের সমস্যাটার রহস্য বুঝতে পারলে তার সমাধান তো সময়ের ব্যপার মাত্র। এখানেও ঠিক তেমনি জাতপাত সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যাটির

রহস্য উন্মোচন করতে হবে। গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। আম্বেদকরের জন্ম থেকেই এই সমস্যার সাথে ছিল ওঠাবসা। বলা ভালো, পদে পদে তাকে জাতপাতের অবহেলার স্বীকার হতে হয়েছে। তার জন্ম হয়েছিল, এক অস্পৃশ্য মাহার পরিবারে। তিনি জাতপাতের সমস্যার ভুক্তভুগী একজন। যা কিনা তাকে ভারতের এই কঠিন সমস্যার গভীরতর উপলব্ধি এনে দিয়েছিল। আর তার সত্য জানার জন্য ব্যাপকতর অধ্যয়ন তার বুদ্ধির অস্ত্রকে শানিত করেছিল।   তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতকে, ভারতের সমস্যাকে। তুলে আনলেন তার সমাধান ও।

কিন্তু কি সেই সমাধান? আম্বেদকর রচনাবলীর পরতে পরতে   পাওয়া যাবে তা। তাছাড়া ভারতের সংবিধানেও তার কিছু ধরা পড়েছে। আম্বেদকরকে আবার কেউ কেউ অন্ধভাবে মানে। যদিও সংখ্যাটা কম। এক্ষেত্রেও কিন্তু সমস্যা। তিনি কিন্তু স্থবিরতা চান নি কখনো। তার সেই সময়কার ভাবনা এখন অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না । আর তিনি বলেও ছিলেন সে কথা।

আমাদের দরকার উন্নয়ন। কিন্তু ভারতের উন্নয়ন তথা অগ্রগতি নিয়ে ভাবতে গেলে আগেই আসবে জাতপাত । আর জাতপাত নিয়ে কথা উঠলে দুটি মুখ আসবে : গান্ধি আর আম্বেদকর। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দু জনের অবস্থান দুই মেরুতে। কিন্তু একই সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে, তাই বলে বিপরীতমুখী হয় কি করে? খুব নির্মোহভাবে তার বিশ্লেষণ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আম্বেদকর কিন্তু শুধু জাতপাত নিয়ে ভাবেন নি ভারতের সমাজের বহুবিধ সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। লিখেছেন ও প্রচুর। সংবিধানে সেই দক্ষতা কিন্তু আমরা পাই।

তাই আমার অভিমত হল, আম্বেদকরকে নিছক জাতপাতের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখাটা সংকীর্ণ মানসিকতাকেই তুলে ধরে। তিনি তার ভারত নিয়ে চিন্তা করেছেন। অন্য রকম ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। আর সেই চিন্তাকে, সেই স্বপ্নকে আমরাও কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। যদিও সময় বদলেছে।

ড. অভিজিৎ রায়ঃ আলোর পথপ্রদর্শক

ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানের বইগুলো পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে, যদি বাংলাতে এই বিষয়গুলো পেতাম, কী ভালোই না হতো। হয়ত এ নিয়েও অনেকে বিতর্ক করবেন।শিল্পবিপ্লবের পরে,ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার একটা জোয়ার এসেছিল, বলতে পারি একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার হাত ধরে বিজ্ঞানচর্চার সূচনা হয় নি। নিছক শিক্ষাবস্তু হিসাবেই বিজ্ঞান পঠিত হয়েছে। দ্বিজেন শর্মার 'বিজ্ঞান শিক্ষা ও আমাদের দায়বদ্ধতা' বইটির একাধিক স্থানে এই ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছ।

পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই আমাদের জন্য বিজ্ঞান অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকলেও ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার ঢেউ কিন্তু আমাদেরকেও আন্দোলিত করেছিল। আমরা বিজ্ঞান নিয়ে একটু আধটু ভাবতে শিখছিলাম। জীবনের পরতে পরতে বিজ্ঞানের বিস্ময় দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে ভাষাগত একটা সমস্যা ছিলই। তবুও আস্তে আস্তে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালিখি শুরু হয়েছিল। বাঙ্গালী অনেক বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও লিখলেন 'বিশ্ব পরিচয়'– বিজ্ঞান নিয়ে বাংলাভাষায় রচিত একটি অনন্য বই।

এদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিও খুব বেগে চলতে থাকল। নিত্য নতুন আবিষ্কার, বিশেষত পরমাণু জগতের বিস্ময় জানার পর বিজ্ঞানীরা সব কিছুকে দেখার নতুন চোখ ফিরে পেলেন। জীবন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া কিছু না তাও জানা হতে লাগল জৈব রসায়নের গবেষনায়। অন্য দিকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যের পাপড়ি খোলা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মত দিচ্ছেন। রহস্য খোজার চেষ্টা করছেন মহাবিশ্বের গোড়ায় যেতে যেতে।

প্রশ্নশীল মানুষ 'ঈশ্বরের ধারণাকে' অনেক আগে থেকেই কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ

করেছে। যুক্তি দিয়ে কেউ কেউ উড়িয়েও দিয়েছিল। মহাবিশ্ব তো আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না? যুক্তি তৈরীর চেষ্টায় বলা হল সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয় কেউ না কেউ আছে। অর্থাৎ একেবারে গোড়ায় গেলেও 'ঈশ্বরের কনসেপ্ট'টাকেই মেনে নিতে হচ্ছে অনেকের।এদিকে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি যে হতে পারে এ ব্যাপারে অনেক কাঁচামাল সংগ্রহ করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। তারাও বৈজ্ঞানিক ভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন।

এখানে দাঁড়িয়ে অনেকে ভাবতে পারেন, বিজ্ঞানীদের কাজ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রশ্ন তুলবে কেন?

এটা এখনো অনেক মেধাবী বিজ্ঞানীও মেনে চলেন। তারা কেউ কেউ ঈশ্বরকে মানেনও, মাঝে মাঝে তার পিছনে যুক্তিও দেন। তবে না মানাদের, বলতে পারি, অবিশ্বাসীদের সংখ্যাও কম নয়। তাদের কথা হচ্ছে বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তাহলে কেন বিশ্বাসের ভাইরাসের কালচার নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না? প্রতিটি ধর্মই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে। তবে, বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞানের আলোকে এই সব নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করেছন অভিজিৎ রায়রা। যার জন্য দরকার হয়ে থাকে সাহসের, প্রয়োজন পড়ে দক্ষতা আর পরিশ্রমের। মুক্তমনা প্লাটফর্ম যেখানে এই কথাই বলে।

স্কুল কলেজে বিজ্ঞান অনেকই পড়েছে, কিন্তু জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখার মতো মন সেখানে তৈরী হয়নি। বায়োকেমিস্ট্রি কেউ যদি ঠিকঠাক বোঝে তাহলে সে বুঝেই যাবে, জীব জগতের এত সব রহস্যের মূলে কিন্তু ওই রসায়নই। শুরু থেকেই। যেখানে কোনরকম সৃষ্টিকর্তার দরকার হয় নি। আমাদের প্রেম-ভালোবাসা, কত বিচিত্র অভিব্যক্তি, কত বিচিত্র আচারণ। সবকিছুর মূলে ওই রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

'ভালোবাসা কারে কয়' বইটিতে সেই কথাই বারবার ধ্বনিত হয়েছে। বিবর্তন যেখানে কার্যকরী করে তুলেছে প্রত্যেকটা ঘটনাকে। বাংলাভাষায় সরাসরি এভাবে অর্থাৎ রসায়নের হাত ধরে বিবর্তনের পথ ধরে মানব মনের এত উচ্চপর্যায়ের সুন্দর বিশ্লেষণমূলক বই এটিই প্রথম।শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা তথা এর বৈজ্ঞানিক গবেষণার একেবারে সদ্য

পাওয়া তথ্যগুলো দিয়ে অভিজিৎ রায় এবং মিজান রহমান সুন্দর সহজবোধ্য ভাষায় লিখেছেন,‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’সৃষ্টির কথা। যা কিনা বাঙালী পাঠকের চিন্তায় একটা নতুন মাত্র যোগ করেছে। প্রশ্ন তুলতে তুলতে গোড়ায় গিয়ে অবশেষে ‘ঈশ্বর’ আছেন —এই সিদ্ধান্ত আর নিতে হচ্ছে না। কেননা, এখানে ‘কিছু না’র থেকেই ‘কিছুর’ সৃষ্টি হচ্ছে যা কিনা বাংলা ভাষায় তুলে ধরেছেন খুব অনবদ্য ভাষায়। আর মীজান রহমান গাণিতিক শূন্যতাকে যেন ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছেন।

সব মিলিয়ে বলতে পারি, বাঙালির থমকে যাওয়া বুদ্ধির চর্চাকে এই বইটি বেগবান করেছে, যা কিনা বাংলা ভাষায় প্রথমই বলতে পারি।

“বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর”-এই ধাচের কত কত কথা আমাদের বিশ্বাসের ভিতকে পোক্ত করতে চায়। কিন্তু যখন ওই বিশ্বাসের জন্যই জ্বলে হিংসার আগুন, ছোটে রক্তের ফিনকি, একই মানুষ বিভক্ত হয়ে যায় বর্ণে বর্ণে—তখন কি বলা হবে? তাহলে কি বিশ্বাসে আর কি আস্থা রাখা যাচ্ছে? যেহেতু যাচ্ছে না সেহেতু প্রশ্ন তুলতে হবে। এই প্রশ্ন তোলা আর তার উত্তর খোজার মধ্যে দিয়ে ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’(অভিজিৎ রায়) এবং ‘অবিশ্বাসের দর্শন’(অভিজিৎ রায় ও আবীর রায়হান) দুটো বই যেন আলোকিত করছে অনেক অন্ধকারাচ্ছন্নকে।

এই দিকটা নিয়ে বাংলাভাষায় কিছু কিছু লেখা হলেও বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বই দুটিতে। খণ্ডন করা হয়েছে অনেক প্রচলিত মিথকে, যা কিনা অন্যন্য।এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমরা বলতেই পারছি, অভিজিৎ রায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় একটা নতুন মাত্রা যোগ করে গেছেন। যেটার খুব দরকার ছিল। সাহস, বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা আর নিরলস পরিশ্রম করে তিনি আমাদেরকে চিন্তা করার এক একটি সহজ পথ দেখিয়েছেন। সৃষ্টি করে গেছেন অসংখ্য লেখক-লেখিকা নিজস্ব অনুপ্রেরণা-নির্দেশনায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন,তবে আমার লেখাও অন্যরকম হতো হয়তোবা। আমাকেও লিখতে বলতেন মুক্তমনায়। কিন্তু যেটা বাস্তব, তিনি নেই। হয়তো,মেডিকেল ছাত্রদের পড়াশোনায় ব্যবহৃত হচ্ছেন নতুবা এখনো শুয়ে আছেন সুরক্ষিত!নিরাপত্তায়!দারুণ নিরাপত্তায়!

শুভ জন্মদিন দাদা। ইতিহাস ঠিকই খুজে নেবে তোমাকে। অন্ধকার কার ভালো লাগে? আলোর পথে আসবেই,তোমার সেই খুব চিন্তার অন্ধকারচ্ছন্ন দেশগুলো!

পড়ালেখার কৌশলঃSQ3R

অনেকেরই প্রতিদিন কিছু তথ্যের সংস্পর্শে আসতে হয়। যা মনেও রাখতে হয়। বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু এর বিজ্ঞানসম্মত কোন পথ আছে কি?

ধরা যাক আপনি আপনার পাঠ্য বইয়ের একটি অধ্যায় কে কার্যকরী ভাবে অধ্যয়ন করতে চান। কিভাবে তা করবেন? চলুন দেখি কিভাবে তা করা যায় :

১.অধ্যায়টি খুলে বসে পড়ুন। শিরোনামটি দেখুন। মোটা দাগে চিহ্নিত উপশিরোনাম গুলোর দিকে নজর দিন; ছবি, ক্যাপশন থাকলে চোখ বুলান; কোন ছক বা চার্ট থাকলে তাও দেখে নিন এক পলক। মোটকথা সারা অধ্যায়টি কি বলতে চাইছে, জরিপ করার মত খুব কম সময়ে দেখে নিন। Survey করুন।

২.এবার আপনার কাজ হবে একটি খাতা কলম নিয়ে বসা। আর প্রশ্ন তৈরি। কিভাবে করবেন প্রশ্ন? ভালো কথা, যে মোটা দাগে চিহ্নিত উপশিরোনামগুলো আছে সেগুলোকে নিজের মত প্রশ্নে রুপান্তরিত করুন। কী,কেন, কিভাবে , কোথায়, কে, কেমন, কত ইত্যাদি প্রশ্নবোধক শব্দ আপনি ব্যবহার করতেই পারেন । আবার, উল্লেখ করো, বিশ্লেষণ করো,শ্রেণী বিভাগ করো, প্রমাণ করো এভাবে ই প্রশ্ন তৈরি করতে (questioning) পারেন।ধারাবাহিকভাবে করবেন।

৩.এখন কি করবেন? আচ্ছা ঠিক আছে , যদি কষ্ট হয় তবে একটু ঘুরে আসুন বাইরে থেকে। এবার, সেকশন ধরে ধরে, যে প্রশ্ন গুলো করলেন, তার উত্তর খোঁজার পালা। বইয়ের থেকে খুঁজতে শুরু করুন। বেশ পরিষ্কার একটা কনসেপ্ট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পড়ুন (Reading)।

৪.এবার বইকে ছুটি দিন কিছুক্ষণের জন্য।বন্ধ করে রেখে দেওয়া হোক ।

আপনার হাতে আছে, আপনার সেই তৈরী করা প্রশ্নগুলো। ধারাবাহিক ভাবে, উক্ত প্রশ্ন গুলোর উত্তর নিজে নিজে মুখে উচ্চারণ করে বলতে থাকুন। কোথাও বেধে গেলে, বইয়ের থেকে দেখে নিন। যতক্ষণ না, একেবারে নিজের থেকে প্রশ্ন গুলোর উত্তর করতে পারছেন ততক্ষণ করতে থাকুন আবৃত্তি (Reciting).

৫. আর ধৈর্য্য থাকছে না? ঠিক আছে কিছুদিন না হয় গ্যাপ যাক। তবে খোজ খবর তো মাঝে মাঝে রাখতে হয়। তাই উক্ত বিষয়টির উপর মাঝে মাঝে আলোচনা, বিতর্ক, লেখালেখি করতেই পারেন। মাঝেই মাঝেই এই 'আবার দেখা' কাজটি করতে হবে (reviewing).

আচ্ছা এই পাঁচটি ধাপকে সহজে মনে রাখার জন্য কি করা যেতে পারে? প্রথম শব্দগুলো নিয়ে দেখি কি হয় :

SQ3R

S=survey

Q=question

R=read

R=recite

R=review

প্রয়োজনই তো উদ্ভাবনের মূলে। তা এই পদ্ধতি এলো কিভাবে?

সে অনেক কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাপতিদের বিভিন্ন বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষণ দেওয়ার জন্য মনোবিজ্ঞানী প্লিজেন্ট রবিনসন আবিষ্কার করেন এই পদ্ধতি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে এখনো সারা বিশ্বের জ্ঞানের সেনানীরা নিজেদের দক্ষ করে তুলছেন। আপনিও পারবেন নিশ্চয়ই।

ফাইনম্যান টেকনিক

অন্যকে শেখালে নিজের শেখাটা আরো মজবুত হয়।এ কথা সবাই জানে।কিন্তু অন্যকে শেখানোর সাথে নিজের শেখার এই সম্পর্ক কেন?সচেতন ভাবে কাউকে কিছু শেখাতে গেলে প্রথমত আমাদের উদ্দেশ্য থাকে খুব সহজে যেন সে বিষয়টা বুঝতে পারে।আর এ জন্য কোন কিছুকে সরলীকরণ করার দরকার পড়ে,নিজের বুদ্ধির প্রয়োগও করতে হয় নিপুণভাবে।হয়তো এই জন্য আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন(যদিও উৎস নির্দিষ্ট নয়),

“যদি কোন কিছুকে সহজে ব্যাখ্যা করতে না পারো, তাহলে তুমি তা যথেষ্টভাবে বুঝতে পারো নি।”

এই ব্যাপারটিকে বিপরীত চিন্তনের মাধ্যমে আমরা এই বলতে পারি:

তুমি যদি কোন কিছুকে ভালোভাবে বুঝতে চাও,তাহলে তাকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো।

কিন্তু কিভাবে তা(সরলভাবে ব্যাখ্যা করা) সম্ভব?আর এটাই আমাদের মৌলিক প্রশ্ন।তাহলে আর দেরি না করে নিজে ঠিক করে ফেলুন কোন বিষয়ে আপনি এই মূহুর্তে শিখতে চান। ঠিক করেছেন?এবার তাহলে একে একে এগিয়ে চলুনঃ

১.যেহেতু সম্ভবত এই মূহুর্তে আপনার কাছ থেকে উক্ত বিষয়ে(আপনি যে বিষয় ঠিক করেছেন) কিছু শেখার মত কেউ নেই(ধরে নিলাম) সেহেতু নোটবই বা খাতা কলমের মাধ্যমেই সেই ‘সরলভাবে ব্যাখ্যা করা’র কাজটি করতে হবে।[আপনি নিজেকে একজন পাঠ্যবই লেখক মনে করুন]

সাদা পেজের উপরিভাগে উক্ত বিষয়টি বড় করে লিখে ফেলুন।

২.আপনার এবার কাজ হবে উক্ত বিষয়ে আপনি যা যা জানেন তাই সুন্দর করে সহজবোধ্য ভাষায় লিখে ফেলা।

যেন আপনার লেখা পড়ে অন্য কেউ বিষয়টি বুঝতে পারেন।শিখতে পারেন।কিন্তু আপনি কি কি জানেন উক্ত বিষয়ে?বিষয়টির উপর নানা দিক দিয়ে একটি একটি প্রশ্ন তুলুন আর উত্তর লিখুন। তবে এক সাথে অনেক প্রশ্ন না করে একটি একটি প্রশ্ন করা আর উত্তর লেখাই ভালো। প্রশ্নগুলোকে প্রয়োজনে আরো বড় করে নিজের করে ফেলুন,নিজের ভাষায় নিয়ে আসুন।উত্তরগুলোও হবে একেবারে আপনার নিজেস্ব কৌশলে, নিজেস্ব চিন্তা -চেতনা থেকে আর নিজের ভাষাতেই।কোন কিছুর (বই বা অন্য কোন তথ্য সূত্রের) সাহায্য নিয়ে লেখা যাবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, যে বিষয়ে আগে থেকে কিছুই জানি না তা নিয়ে কি লিখবো?এক্ষেত্রে, বিষয়টি পুরোপুরি ভালোভাবে স্টাডি করে নিতে হবে।

৩. এবার আপনি বই খুলবেন। দেখবেন,কোথায় কোথায় কি কি বাদ পড়ে গেছে।কি কি অজানা আছে সেগুলো চিহ্নিত করুন। রবি ঠাকুরের ভাষায়-

“... জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান...”

এবার এই অজানার আহবানে জানার জন্য আরো আরো স্টাডি শুরু করতে হবে।সহজভাবে ব্যাখ্যা করার তাগিদ যেন থাকেই থাকে।

৪.আবার সব কিছু সুন্দর করে,সাজিয়ে গুছিয়ে,বাহুল্য বর্জন করে, সহজ সরলে ভাষার গাঁথুনিতে লিখে ফেলুন। এমন ভাবে লিখুন যেন সহজে বোধগম্য হয়। দুর্বোধ্যতা যেন আর যেন না থাকে।

আপনি এবার উক্ত বিষয়ে মাস্টার-স্টুডেন্ট হয়ে ওঠবেন।আর এই টেকনিকটা কিন্তু বিখ্যাত একজন পদার্থবিজ্ঞানীর দ্বারা আমরা জেনেছি।তিনি,রিচার্ড ফিলিপস ফাইনম্যান(১৯১৮-১৯৮৮)।আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষনা করেছেন তিনি। নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

পড়ালেখার কৌশলঃSOAR

ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতার মূল্যায়নের সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রদত্ত প্রশ্ন সেটের উত্তরদান।বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন টাইপের প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ পরিমাপ করা হয়ে থাকে।তাদের উত্তরের যথাযথতা দিয়েই তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ বোঝা যায়।এখন প্রশ্ন হল,উত্তর দেওয়ার যথাযথতাই বা কিসের উপর নির্ভর করে?অর্থাৎ তারা দক্ষতার কোন স্তরে পৌঁছালে নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারবে?

তবে আরেকটি প্রশ্ন করতেই হচ্ছে 'প্রশ্ন' আসলে কি?

সংক্ষেপে বলতে পারি-

তথ্যের সংকটসূচক বাক্যই হল প্রশ্ন।

আর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের অভাব দেখা যায়।যা প্রকাশ করা হয়ে থাকে কতগুলো প্রশ্নবোধক শব্দ(কে,কেন,কোথায়,কীভাবে,কখন,কত ইত্যাদি)দিয়ে।যদিও একটি প্রশ্নে আবার একাধিক 'তথ্যাভাব' থাকতে পারে।

বন্ধুরা 'তথ্যাভাব'শব্দটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন।

নিচের প্রশ্নটি পর্যবেক্ষণ করা যাক-

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের অস্তিত্ব বিবেচনার প্রয়োজন হয়েছিল কেন?

এখানে 'কেন' শব্দটি দিয়ে কোন ধরনের তথ্যের অভাব সূচিত হয়েছে যার উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে?

—পরমাণুর ইলেক্ট্রন ও প্রোটন -এর সমগ্রভরের থেকেও একটি পরমাণুর ভর বেশি।এমন কিসের জন্য তা হচ্ছে?এই প্রশ্নটিই নিস্তড়িত নিউট্রনের অস্তিত্ব

বিবেচনায় প্রভাব ফেলেছিল।

ওই ‘কেন’ শব্দটি মূলত এই তথ্যের অভাবকে সূচিত করছে।

কিন্তু আমরা কিভাবে বুঝব কোনো প্রশ্নবোধক বাক্য বা শব্দ কোন তথ্যের অভাবকে সূচিত করছে?উক্ত প্রশ্নটির দিকে আবার চোখ ফেরানো যাক।ওটাকে ভাঙ্গলে আমরা তিনটা জিনিস পাচ্ছি—পরমাণু,নিউক্লিয়াস এবং নিউট্রন।

এই তিনটি ব্যাপারে আগে থেকে জানতে হবে।জানতে হবে এদের মধ্যে রিলেশনই বা কী?আর কিভাবেই বা তা গড়ে ওঠেছে?

এবার প্রশ্ন হল কিভাবে জানবো এদের মধ্যে রিলেশন কি?

এটা নির্ভর করে যখন উক্ত বিষয়টি আমরা অধ্যয়ন করছি, তখন কোন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কোনটির ধারনা এসেছে তার উপর।ঠিক এই জন্য, বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে প্রশ্নের উত্তর করতে যাওয়া ঠিক নয়।প্রশ্নটি কেন জন্ম নিল এটি না জেনে তার উত্তর করা যদিও সম্ভব (এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাইই করে)কিন্তু তা কোন বুদ্ধির উন্নয়ন ঘটাতে পারে না স্বাভাবিক ভাবে।

বোধহয় আমাদের ‘সৃজনশীলতা’থেকে পিছিয়ে পড়ার এই একটি অন্যতম কারণ।যদিও ব্যাপারটি এমন ভাবে আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে যে তা নিয়ে প্রশ্নই তুলতে চাই না।কোন একটি বিষয়ের উপর যখন প্রশ্ন তুলে তুলে ধারনা ক্লিয়ার করব তখনই আমরা বুঝে যাবো উক্ত বিষয়ের সাথে অন্য অনেক বিষয়ের রিলেশনশিপটা।আর এর জন্য ‘সংযোগমূলক’নানা প্রশ্ন করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব হবে?

—বিষয়বস্তুর নানা দিককে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে।আর এটা দেখার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো নির্দিষ্ট বিষয়কে সুন্দর করে সাজানো।যেটা

বিভিন্নপদ্ধতিতে করতে পারি আমরা-

শ্রেণিবিন্যাস করে,ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে,ক্রমিকভাবে বা ব্যাখ্যামূলক।

কোনটি অনুসরণ করব তা নির্ভর করবে বিষয়বস্তু কিভাবে উপস্থাপিত।

কিন্তু যে পদ্ধতিই অনুসরণ করি না কেন,সেটাকে সহজ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল হল-

আগে নোট সংগ্রহ করা।সম্পূর্ণ নোট আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বিষয়বস্তুকে সাজাতে সাহায্য করে।কিন্তু সম্পূর্ণ নোট কিভাবে সংগ্রহ করা যায়?

এর জন্য আপনি, বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।মাইন্ড ম্যাপিং, কর্নেল মেথড,ডেসক্রিপশন পদ্ধতি ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমরা অনেকটা জটিলতার মধ্যে ছিলাম।এখন সহজ করে বলতেই হবে কোন বিষয়ে(টেক্সটবুকের)আপনাকে দক্ষ হতে গেলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেনঃ

১.নির্বাচন করা(Select): যে বিষয় পড়বেন তার উপর একটি পরিপূর্ণ নোট সংগ্রহ করুন।

২.সাজিয়ে নেওয়া(Organise): সংগৃহীত নোট ভালো করে সাজিয়ে নিন।আপনি শ্রেণিবিন্যাস করে,ম্যাট্রিক্স সিস্টেমে করতে পারেন।

৩.সংযোগ করা(Associate):সাজানো বিষয়গুলোর মধ্যে নানা প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করুন।প্রশ্ন তুলে তুলে।

৪.নিয়ন্ত্রিত করা(Regulate):এবার আপনি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করুন নিজেকে।নিজে তৈরি করুন। বইয়ের প্রশ্ন দেখুন।উত্তর করুন।নিজের মূল্যায়ন নিজে করুন।বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সাথে পরিচিত হয়ে যান ধীরে ধীরে।

সমগ্র পদ্ধতিকে একসাথে আমরা বলা হয়-SOAR STUDY TECHNIQUES.

যেখানেঃ

S-Select

O-Organise

A-Associate

R-Regulate

Ken. Kiewra নামের একজন শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

দক্ষতার মূল্যায়ন মডেল

কিভাবে যাচাই করবেন শিক্ষার্থীদের দক্ষতার?অর্থাৎ একজন শিক্ষক হিসেব আপনি শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদান দেওয়ার পর তারা কে কতটা শিখল তা যাচাই করবেন কিভাবে?

তাহলে আপনাকে অবশ্যি কিছু প্রাথমিক ধারনা নিতেই হবে। হয়তো আপনার তা আগেই জানা থাকতে পারে। তবুও একটু আলোচনা করা যাক।

শিক্ষণ আসলে কি? শিক্ষণের দরকারই বা কেন? শিক্ষণ মানে বলতে পারি আচারনের পরিবর্তন । যদিও শিক্ষাবিজ্ঞানে নানা মতবাদ রয়েছে এর উপর। তাহলে, প্রশ্ন হল এই আচারণের পরিবর্তন কি? অর্থাৎ নানান উদ্দিপকের ভিত্তিতে আমাদের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন। এটার প্রয়োজনীয়তা কি? আমাদের সমাজে এখনো নানা ধরনের সমস্যা জিইয়ে আছে, যা রীতিমত আমাদের অনুভূতিতে শান্তি না এনে দুঃখ আনে, কষ্ট আনে। মনে হয়, যদি কোন পথ পেতাম! কিন্তু যেটা সত্য তা হল, এর পথ কখনো পাওয়া যায় না যদি না বৈজ্ঞানিক পথে না এগোনো যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগোলে আমাদের আচারণের যে পরিবর্তন আসে একমাত্র তা দিয়ে মোকাবিলা করা যায় আগত সমস্যার। তাই তো আমাদের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর ।

সমস্যার সমাধান করা তথা নতুন কিছু করতে গেলে (creating) প্রয়োজন হয় বুদ্ধিবিকাশ। তবে একজন একটা বিষয়ে কখন নতুন কিছু করতে পারে তথা নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পারে ? যখন সে উক্ত বিষয়ের উপর সে বিশ্লেষণী দক্ষতা (analyzing skills) অর্জন করে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? বিশ্লেষণ করা মানে– ভাঙ্গা। আমাদের এখানে কোন ধারনাকে ভাঙ্গা। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাতে হবে বিষয়টির

দিকে। আইডিয়াকে বিভিন্নভাবে দেখার প্রয়াস চালাতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি হবে কিভাবে?কোন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে গেলে সেই আইডিয়া টিকেও তার উৎপত্তিগত দিক দিয়ে দেখতে হবে তাহলে বিষয়টি যেমন বোঝা যাবে (understanding) তেমন মনেও থাকবে (remembering). উক্ত ধারনা ব্যবহার করে বা প্রয়োগ করে (applying) নানামুখী সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর তখনই তৈরি হবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।

এখন কথা হচ্ছে, স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থী কতটা শিখছে বা শিখেছে তা পরিমাপ বা হিসাব করব কিভাবে?

উপরিউক্ত পদক্ষেপ গুলোতে ছাত্রছাত্রীরা কতটা দক্ষতা অর্জন করছে, তা মাপলেই কিন্তু মূল্যায়ন টা বেশ উচ্চমানের হবে । আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম আবিষ্কার করেন এই বিন্যাস। তার নাম অনুসারে একে ‘ব্লুম ট্যাক্সনমি’ বলা হয়।

শেষমেশ আমরা বলতে পারি, অনুধাবিত তথ্যের প্রয়োগ বৈচিত্র্যতায় ধরা পড়ে ভিন্নতা, আর সেই ভিন্নতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতুন কোন সিদ্ধান্ত কতটা নিতে পারছে তার পরিমাপ করাটাই হতে পারে একটা মূল্যায়ন মডেল।

Bloom Taxonomy:

১) Remembering

২)Understanding

৩)Applying

৪)Analyzing

৫)Creating

শ্রেণিকরণ: পদ্ধতিগত ত্রুটি

শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার। কেননা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে শিক্ষাই প্রধানতম নিয়ামক। এই জন্য গড়ে উঠেছে শিক্ষা ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থায় যখন অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে তখন জীবনযাত্রায়ও দেখা দেয় নানা সমস্যা। আমার নিজের দৃষ্টিতে তেমনই একটি অসামঞ্জস্যতা আমাদের ক্লাসগুলোতে কোন কিছুর 'শ্রেণীবিভাগ' করার সময় পাঠদানের পদ্ধতি:

ধরা যাক, জীব বিদ্যার 'জীবের জনন' নামে একটি অধ্যায় স্যার পড়াবেন ।

তিনি প্রথমে জনন কাকে বলে তার একটি সংজ্ঞা দেন। ক্ষেত্র বিশেষে দুই একটা উদাহরণ ও দেন।তারপর বলেন," জনন কয় প্রকার ও কি কি?উদাহরণ দাও।"

বিস্তৃত আলোচনা করে কয়েকদিনের মধ্যে অধ্যায় টির পাঠদান শেষ করেন।

এখানে আমার প্রশ্ন হল, আগে শ্রেণীবিভাগ নাকি আগে চারপাশের জীবের জননগত নানা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ? আমাদের চারপাশের কতশত জীব নিজেদের বংশকে বাড়িয়ে চলছে। কত শত ভিন্নতা তাদের এই বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিতে।আমাদের কি আগে এই বিচিত্র জনন প্রক্রিয়ার দিকে তাকানো উচিৎ নয়? আর এভাবে তাকালে তো আমরা নিজেরাই শ্রেণীবিভাগ করতে পারব এক সময়।

আর সংজ্ঞা তো অনেক পরের ব্যাপার। কেননা কোন কিছুকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে সে বিষয়ে বিস্তৃত জানার, বলতে পারি সার্বিকভাবে জানার প্রয়োজন।

একটা প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে এখানে,'শ্রেণীবিভাগ'কেন?

নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে কোন কিছুকে বিশেষ কোন শ্রেণীতে স্থান দান। কিন্তু তারই বা প্রয়োজন কেন?

আসলে সত্যি কথা বলতে কি 'শ্রেণীবিভাগ' ছাড়াও কোন কিছু অধ্যয়ন সক্ষম হওয়া যায় কিন্তু সেটা একটু জটিলই হয়। শ্রেণীবিভাগ বিস্তৃত কোন বিষয়ের সহজতর অধ্যয়নের একটা বিশেষ সুবিধা দেয়। সময় কেও বাচায়।

কিন্তু আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেভাবে 'শ্রেণীবিভাগ' শেখায় তা কতটা ফলপ্রসূ ?

আগে তাহলে আমাদের শিক্ষণে 'ফলপ্রসূতা'র মাত্রা চিহ্নিত করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষণে (cognitive level) শিক্ষার্থীর নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া বা নতুন কিছু তৈরি করে তার মূল্যায়ন করাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন কিছু করার ভিত্তিটা তখন খুব ভালোভাবে তৈরি হবে। বিশ্লেষণী দক্ষতাটা খুব ভালো হবে। আর বিশ্লেষণী দক্ষতার মান নির্ভর করে শ্রেণীবিভাগ করতে পারার মানের উপর। আর এই শ্রেণীবিভাগ করার দক্ষতা নির্ভর করে কতটা দার্শনিকভাবে আমরা কোন কিছুকে দেখছি।

আমাদের ক্লাসগুলোতে পাঠদান পদ্ধতি যদি আমরা খেয়াল করি তবে দেখবো যে, এই দর্শনকেই সব চেয়ে বেশী অবহেলা করা হয়। বিজ্ঞান ক্লাসগুলোতে তো সিলেবাসের চাপে আরো বেশী অবহেলার শিকার হয় এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণটা।

আমরা কিন্তু বলতেই পারি, আমাদের সৃজনশীলতায় বন্ধ্যাত্বের কারণও খানিকটা এইখানে। কিন্তু কেন শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই পথ অবলম্বন করেন? এক কথায় বলতে পারি, তাদের দক্ষতার অভাব। এই দক্ষতার অভাবের জন্য দায়ী কী?এখানে একতরফা ভাবে আমাদের শিক্ষক /শিক্ষিকাদের দোষারোপ করাটা কখনোই ঠিক হবে না। কেননা আমাদের শিক্ষা সিস্টেমে শিক্ষার লক্ষ্য অনেক শিক্ষকের কাছে পরিষ্কার নয়। যেখানে 'পরীক্ষা পাশ তথা ভালো রেজাল্ট' করাটা এখনো অধিকাংশের লক্ষ্য। সমাজের কাছে একজন শিক্ষার্থীর মুল্যায়নও এই রেজাল্ট ভিত্তিক। ফলে আমাদের শিক্ষকেরা কতটা 'শিখন' তা পরিমাপ করতে পরীক্ষা নেয় যার মূল উদ্দেশ্য

এখনো পরিষ্কার নয় এবং পদ্ধতিগত নানা ত্রুটি যেখানে বিদ্যমান। আর এই ত্রুটিকেই প্রাধান্য দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি 'চাকরী বা কর্মসংস্থান' বেশ নিয়োগ নিচ্ছে। আমার মনে হয়, নিয়োগের এই মূল্যায়ন পদ্ধতি পাল্টালে শিক্ষার লক্ষ্যটাও সমাজের মানুষের কাছে বদলে যাবে। শিক্ষক/শিক্ষিকারাও তখন দক্ষ হয়ে ওঠবে।

আর দক্ষ শিক্ষক /শিক্ষিকা বদলে দেবে সমাজ, বদলে দেবে প্রজন্মের চাহিদা। আর বোধহয় একমাত্র তখনই আমরা সৃজনশীল হয়ে উঠব।

গণিতঃনিজেই শেখান নিজেকে

নিজেই নিজেকে শেখানো!স্বশিক্ষিত হওয়া!মনে করা যাক,আপনি কোন দিন উচ্চতর বীজগণিত করেন নি। এবার যদি জিজ্ঞাসা করি,বইপত্রের সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে উচ্চতর বীজগণিত আপনি শিখতে পারবেন কি?

অথবা যদি বলি, আপনি ভাষাবিজ্ঞানের স্টুডেন্ট। এখন আপনার 'তরঙ্গ' সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে জানার ইচ্ছা দেখা দিল।বেশ কিছু বইপত্রও সংগ্রহ করলেন।কিভাবে নিজেকে নিজেই 'তরঙ্গ' সম্পর্কে শেখাবেন?

হ্যা,আপনি যদি নিজেই নিজেকে কোনো কিছু শেখাতে পারেন, তাহলে ঐ বিষয়ে আপনি স্বশিক্ষিত।তবে এটা করা কিভাবে সম্ভব?

আজ আমি শুধুমাত্র 'গণিত' বিষয়টা কিভাবে নিজেকে নিজেই শেখানো যায় -তাই নিয়ে কথা বলব।তবে আমাদেরকে প্রথমে যে প্রশ্নটার উত্তর জানতে হবে তাহলঃ

'গণিত শেখা' মানে কি?অর্থাৎ আমরা গণিতে কোন পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করলে বলতে পারবো গণিত শিখেছি?আর আমাদের সেল্ফ লার্নিং অভিযানে ঠিক এই প্রশ্নটির উত্তর গুরুত্ব খুবই।যা কিনা আমাদের কোনদিকে কিভাবে এগোতে হবে তার নির্দেশনা দিবে।এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি,নির্দিষ্ট লেভেলের গাণিতিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারলে (অবশ্য নিজের যৌক্তিক চিন্তার পদ্ধতিতে)আমরা তাকে গণিত জানে বলে ভাবতে পারি।সমস্যা যদি এদিক ওদিক ঘুরিয়েও দেয় তবে সে তার সমাধান করতে পারে।

আর এটাই যদি 'গণিত শেখা'র সংজ্ঞা হয়, তবে আমাদের লক্ষ্য হল,নির্দিষ্ট লেভেলের সমস্যার সমাধান নিজের চিন্তার পদ্ধতিতে সমাধান করা। এটার জন্য যা করতে হবে,আমরা তাই করবো।তার আগে আরেকটি বিষয় আমরা

পরিষ্কার হয়ে নিই,একজন শিক্ষক এবং একজন স্টুডেন্টের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?(গণিতের ক্ষেত্রে)

এক্ষেত্রে,আমি আমার কলেজের গণিত ক্লাসের ব্যাপারটি আনতে চাইঃ

এক বন্ধু, একটি সমস্যা স্যারকে দিলো।স্যার বোর্ডে লিখলেন।উপস্থিত আমরা কেউই সমস্যাটির সমাধান করতে পারি নি।এবার স্যার, শুরু করলেন ধীরে ধীরে এগোনো।এবং এক পর্যায়ে সমাধান করলেন।

এখানে আমার বিস্ময়,স্যারের বুদ্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গি এমন কোন পর্যায়ে আছে যাতে করে,সমস্যাটির সমাধান করে ফেললেন?ঠিক যেমন আমি নিচের ক্লাসের অনেক সমস্যার সমাধান এভাবে করি?এমনও হয়, ঠিক ওই সমস্যাটি আমি আগে কোনদিন সমাধান করি নিই,অথচ নিজের বুদ্ধিতে ধীরে ধীরে সমাধান বের করে ফেলছি,যেমনটি স্যার আমাদের উক্ত সমস্যাটির ক্ষেত্রে করলেন।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, আমি কেন পারলাম?

—প্রথমত,সমস্যাটি ঠিক ভাবে বুঝেছিলাম তাই।

কিন্তু আসল প্রশ্নই বাদ পড়ে গেছেঃগাণিতিক সমস্যা মানে কি?

সাধারণত, পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক গাণিতিক ধারণা একটি গাণিতিক সমস্যা তৈরি করে থাকে।যেখানে এক বা একাধিক গাণিতিক ধারণার মান দেওয়া থাকে এবং এক বা একাধিকের মান দেওয়া থাকে না।যেগুলোর থাকে না,সেগুলো কিন্তু যেগুলো দেওয়া থাকে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত।আর এই সম্পর্কের হাত ধরে যেটার বা যেগুলোর মান নেই তা বের করতে বলার নামই গাণিতিক সমস্যা।

এবার আসি আগের সেই প্রশ্নে,গাণিতিক সমস্যা বোঝা মানে কি?উত্তরে বলতে পারি,একটা গাণিতিক সমস্যায় যে একাধিক ধারণা আছে, তাদের মধ্যে রিলেশন যে আছে তা বুঝতে পারা।এবং যেটা বা যেগুলো বের করতে বলছে তাদের সাথেও যে রিলেশন আছে তা বুঝতে পারা।

এটা কিভাবে সম্ভব?বেশ,তাহলে একটা কাজ করা যাক।

মনে করা যাক,চারজন মানুষকে তোমার সামনে আনা হল।যারা কিনা একে অপরের আত্নীয়।এখন তোমাকে প্রশ্ন করলাম, কে কার কী হয়?

তুমি সহজেই তাদেরকে প্রশ্ন করে বুঝতে পারবে।

তবে সম্পর্কসূচক শব্দগুলোর যথার্থ অর্থ যদি আপনি না জানেন বা বোঝেন তবে কি আপনি মামা-ভাগ্নের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা ধরতে পারবেন।ঠিক তেমনি গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে নানা কনসেপ্ট যদি আপনি ঠিকভাবে না বোঝেন তাহলে সম্পর্ক বুঝতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কি?এখানে বলে রাখি,এগুলো না বুঝেও বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কিন্তু গণিতের সমাধান করছে।এক্ষেত্রে কি বলা যায়?বলা চলে এটাই আমাদের গণিত শিক্ষায় একটা প্রচলিত পদ্ধতি যেখানে কিনা গণিতিক প্রক্রিয়া একটা মেশিন, অনুভূতির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।এতে করে,অনুসরণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলে ঠিকই কিন্তু গণিত শিক্ষায় যে আবিষ্কারের আনন্দ তা থাকে না।তখন তা হয়ে ওঠে কৃত্রিম।কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে,কিভাবে বুঝবো, গাণিতিক কনসেপ্ট গুলো?

এর জন্য প্রথমত আপনাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং প্রশ্নশীল হতেই হবে।মনের কোণে জেগে ওঠা সংশয় বা সন্দেহকে প্রশ্নের আকার দিয়ে তুলে আনতে হবে -অন্যের কাছে না হোক অন্তত নিজের কাছে। একটা গাণিতিক প্রক্রিয়া, ধরা যাক,ভাগ প্রক্রিয়া—এটা আসলে কি?কিভাবে এটা কাজ করে?এই প্রশ্নটা শুনে অনেকেই হাসবেন, কিন্তু আমি জানি, অনেকেই এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবেন না।ঠিক এমন হবে যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রেও।যোগ বা বিয়োগ ব্যাপারটাকে আমরা একটা প্রক্রিয়া হিসাবেই শুধু কাজে লাগিয়ে গেছি।কোনোভাবে অনুভব করার মত মনোভাব নিয়ে নয়।

এবার আপনাকে কোনো একটা বিষয়ে ধারনা অর্জনের জন্য অগ্রসর হতে হবে।প্রথমত উক্ত বিষয়ের বই খুলে পড়তে শুরু করতে হবে।ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কনসেপ্টকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে ফেলে এগোতে হবে।(এই ব্যাপারটি নিয়ে ভাববার খুব গুরুত্ব)।তবে যদি বেধে যায়,তবে কোন কনসেপ্ট

টি না জানার জন্য এটা বেধে যাচ্ছে তা খুজে দেখতে হবে।তারপর আগে সেই বিষয়টি জেনে আসতে হবে।এভাবে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কনসেপ্ট এমন ভাবে জানতে হবে যেন আপনি আবিষ্কার করছেন।আর এটা যদি করতে পারেন,বিভিন্ন কনসেপ্টের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আপনি অনুভব করতে পারবেন।যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন সমস্যাটির ভিতরে কি কি গাণিতিক ধারনা কার্যকর আছে সেগুলোকে বের করে ফেলতে হবে।কিভাবে তা করা যায়?যেহেতু আগেই আপনি কনসেপ্টচুয়াল একটা ধারনা পেয়ে গেছেন এবার আপনার কাজ হবে সেই কনসেপ্ট গুলোর অস্তিত্ব উক্ত সমস্যায় আছে কিনা খুজে বের করা।থাকলে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের রিলেশনশিপ কিভাবে গড়ে ওঠে তা তুলে আনা।এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে এই প্রসঙ্গ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলতে হবে,তা হল রিলেশনশিপ কিভাবে প্রকাশ পায়?সহজ করে বললে বলতে পারি,প্রত্যকটা সূত্রই একাধিক বিষয়ের রিলেশনকেই প্রকাশ করে।অর্থাৎ সূত্রে দক্ষতাই আমাদেরকে রিলেশনটা কিভাবে বিদ্যমান তা বুঝতে বা জানতে শেখাবে।কিন্তু আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন এসেই যায়,সূত্রে দক্ষ হওয়া যায় কিভাবে?অধিকাংশই কিন্তু প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সূত্র মনে রাখে।অর্থাৎ কোন সূত্র কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করতে করতে ধীরে ধীরে সূত্র মনে গেথে যায়।এটাকে আমিও শ্রেষ্ঠ একটা টেকনিক মনে করি।তবে কাজটি যেন সুন্দর এবং পরিকল্পিত হয় তার জন্য একটা পদ্ধতির কথা বলছিঃ

গণিতের যেকোনো বইয়ের প্রত্যকটি অধ্যায়ের শুরুতে নির্দিষ্ট বিষয়ের গাণিতিক ধারনাগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়।যেখানে কিভাবে সূত্রগুলো এলো তা প্রমাণসহ থাকে।(অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই অংশটি তেমন গুরুত্বই দেন না।দিলেও এতো তাড়াতাড়ি করিয়ে সমস্যা সমাধানে নজর দেন, আসলে ছাত্রছাত্রীদের উক্ত বিষয়টি আদৌ বোধগম্য হল কিনা তা দেখার অবকাশ থাকে না।ভেবে নেন সমস্যা সমাধান করতে দিলেই শুধু হবে)।এই অংশটি খুব ধীরে ধীরে আবিষ্কারমূলক পড়ার মাধ্যমে(নিজেই প্রশ্ন করে করে এমনভাবে পড়তে হবে যেন মনে হবে আমিই বিষয়টি আবিষ্কার করেছি)শেষ করতে হবে।সূত্রগুলো প্রমাণসহ উপলব্ধি করতে হবে।তখনও সেগুলো মনে না

থাকলে সমস্যা নেই।এখন আপনাকে একটি খাতায় প্রত্যকটি সূত্রের জন্য কিছু জায়গা তৈরি করতে হবে।যেখানে উপরে থাকবে সূত্র এবং নিচে থাকবে উক্তসূত্রের প্রয়োগগত নানা সমস্যা।কিন্তু নির্দিষ্টভাবে উক্ত সূত্রের প্রয়োগ হয় এমন সমস্যা কোথায় পাবো?

এরজন্য আপনাকে তার পর পর যে উদাহরণগুলো(Examples) আছে সেগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।প্রত্যকে সমস্যার সমাধান যদি নিজে নিজে না করতে পারেন তবে এখান থেকেই একটা নতুন চিন্তা মাথায় আনতে হবে।আপনার এই উদাহরণগুলোই(Examples)আপনার শিক্ষক হবে।তার আগে আপনাকে আপনার একটু আগে করা সূত্রগুলোর এপ্লিকেশন দেখতে হবে।এর জন্য, প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানের কোথায় কোন সূত্র প্রয়োগ হচ্ছে তা খুজে বের করতে হবে।

আর এই গুলোই হল,প্রত্যকটি সূত্রের জন্য আপনার আলাদা আলাদা সমস্যা।এভাবে সম্পূর্ণ উদাহরণের সমাধান থেকে সূত্রের প্রয়োগত সমস্যা আপনাকে তুলে আনতে হবে।প্রয়োজনে আপনাকে নিজেকে দুই একটা সমস্যা তৈরি করতে হবে।আর এই সমস্যাগুলো নির্দিষ্ট সূত্রের প্রয়োগে বার বার সমাধান করতে হবে।বারবার।যতক্ষণ না না দেখে আপনি সূত্রটা উক্ত সমস্যায় প্রয়োগ করতে পারছেন।এভাবে করতে থাকলে সূত্রটা আপনার মস্তিষ্কে গেথে যাবে।আপনি আর ভুলবেন না।প্রয়োজনে আপনি বিভিন্ন টেকনিক অনায়াসে ব্যাবহার করতে পারেন।

আসলে এই সূত্র মনে রাখা মানেই রিলেশনশিপ মনে রাখা। আর রিলেশনশিপটা মনে রাখতে পারলেই আপনার সমস্যার সমাধান চলে আসবে।

সুতরাং এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারছি,সূত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে আপনি রিলেশনশিপটা মাথায় গেথে নিয়েছেন।কিন্তু এখনো আপনার কাজ বাকী আছে খানিকটা।এখানে কোন রিলেশনশিপটা বা সূত্রটা কাজে লাগবে - সেটা আপনাকে বুঝতে হবে।কিন্তু বুঝবো কিভাবে?

হ্যা,এবার আপনাকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে

উক্ত সমস্যাটি আসলে কি বের করতে বলছে বা খুজতে বলছে? ওই দিকে তাকিয়েই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন সূত্রটি আনতে হবে।কিন্তু তা কিভাবে?

এটা করার জন্য আপনাকে ভাবতে থাকতে হবে।অনবরত ভাবতে হবে।আর গণিতের মৌলিক পরিশ্রমের অনেকটাই দিতে হয় কিন্তু এখানেই।যারা এই স্তরে পরিশ্রমে নারাজ তারা গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে অক্ষম হতে পারে।কেননা এখানে আপনার বুদ্ধি প্রয়োগের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর।অনেক সময় যেতে পারে।তবে আমার মনে হয় সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে আপনাকে মূল সমস্যাটি নিয়ে আরো বেশি সময় কাটাতে হবে।কেননা সমস্যার রহস্য যদি বোঝা যায় তবে তার সমাধান করা সহজ হয়।

প্রয়োজনে সমস্যাটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।এখানে আইনস্টাইনের দুটি কথা মনে রাখতে হবেঃ

“আমার হাতে যদি সমস্যা সমাধানের জন্য ১ ঘন্টা সময় থাকে তবে আমি ৫৫ মিনিটই সমস্যাটি নিয়ে ভাবি।আর ৫ মিনিট নিই সমাধানের জন্য”

“যে চিন্তায় একটি সমস্যার জন্ম হয়েছে সে চিন্তা দিয়ে তার সমাধান করা যাবে না।”

তথ্যসূত্রঃ How to solve it By Gorge Polya

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার কৌশল

যদিও বিজ্ঞান কোন বিষয় না ।আসলে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত তথ্য বা জানাকেই বিজ্ঞান বলে।তবে প্রশ্ন এখানে এসেই যাচ্ছে,বিশেষ পদ্ধতিটাই বা কেমন?সহজে বললে,কোন একটা সমস্যা নির্দিষ্ট করার পর সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে(এবং বিজ্ঞানীদের নিজেস্ব চিন্তার ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে) একটা অনুমিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তার সঠিকতা যাচাই করার জন্যে পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন তথ্য প্রদান করাকেই আমরা বলতে পারি বৈজ্ঞানিকভাবে অর্জিত তথ্য।বা বিজ্ঞান।

আর আজকে আমাদের প্রসঙ্গ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা নিবন্ধ লেখার কলাকৌশল। এখানে আমি আমার নিজেস্ব কতকগুলো পদ্ধতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই।পাঠকরা যদি আগ্রহী হয় তাহলে তারা একটু চেষ্টা করলেই আরো বেশি ফলপ্রসূ পদ্ধতি পেয়ে যাবে।

বিজ্ঞান কি জানা পরে একটা প্রশ্ন করাই যেতে পারে তাহল,কিভাবে বিজ্ঞানের এই তথ্যকে প্রকাশ করা যায়? বা প্রসার অথবা প্রচার?যাইহোক বিভিন্ন পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।যেমনঃবক্তব্য,বিভিন্ন ডকুমেন্টারি,লেখালেখি,সিনেমা ইত্যাদি।তবে আমরা এই পদ্ধতিগুলো থেকে তুলে নেবো শুধু লেখালেখিটাকে।

লেখালেখির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য অন্যকে আমরা জানাতে পারি।কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে,লেখালেখিরও তো শ্রেণীবিভাগ আছে।উপন্যাস,নাটক,প্রবন্ধ,কবিতা--কত কি?তারপর আছে বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী।

তবে আজকে আমাদের নির্ধারিত বিষয় হচ্ছে প্রবন্ধ।কিভাবে এই প্রবন্ধ আমরা লিখতে পারি এটাই আমাদের এই আলোচনার মুখ্য প্রশ্ন।

প্রথমত, আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কী লিখবেন?

বিজ্ঞান নিয়ে লেখার এখানেই মস্ত স্বাধীনতা।আপনি সবকিছু নিয়েই লিখতে পারেন।কেননা আমাদের যাবতীয় সব কিছুকে স্পর্শ করেছে বিজ্ঞান।কাঠ-খড়-কাগজ,মাটি-পুতুল, কাগজ,সূর্য,সাবান,চুল,হাতি -ঘোড়া,তালগাছ,আমের মুকুল---কত কত বিষয়!তারপর আছে ধর্মীয় বিশ্বাস, আছে নানান কুসংস্কার,আছে রাজনীতি, আছে অর্থনীতি। অর্থাৎ আপনার সামনে বিষয়বস্তুর দুয়ার খোলা আছে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখার জন্যে।আপনাকে শুধু নির্বাচন করতে হবে কোন বিষয়ে আপনি লিখবেন।এক্ষেত্রে আপনার আগ্রহ বিশেষভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

তবুও আপনি কি লিখবেন ঠিক হওয়ার পর আপনাকে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেকে করতে হবে—উক্ত বিষয়টা আপনি কেনো লিখবেন?মানে, আপনার উদ্দেশ্য কি?আসলে আপনি লেখার মাধ্যমে কি চাইছেন?

যেমন ধরা যাক,আপনি ঠিক করলেন, 'চাঁদ' নিয়ে কিছু লিখবেন।এবার প্রশ্ন হল চাঁদ নিয়ে লেখার আপনার উদ্দেশ্য কি?

আপনি কি,যাদের জন্য লিখছেন তাদেরকে চাঁদ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারনা দিতে চান?

নাকি 'চাঁদ' নিয়ে মানুষ কিভাবে জানল তার একটা পরিক্রমা তুলে ধরে পাঠকদেরকে চাঁদ সম্পর্কে আরো আগ্রহী করে তুলতে চান?

এভাবে নিজের কাছেই আপনার লেখার উদ্দেশ্য নিজেকে পরিষ্কার করতে হবে।

এবার কাজ হবে আপনার তথ্য সংগ্রহ তথা পড়াশোনা বা অন্য কোনো ভাবে উক্ত বিষয়টা খুব ভালো করে জানা।কিভাবে জানবেন?বইপত্র থাকলেই যে সব হবে তা নয়।তাছাড়া,ইন্টারনেট থেকে অনেক তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারি খুব সহজেই।কিংবা উক্ত বিষয়ের উপর অনেক বইও পেতে পারি ইন্টারনেট থেকে।সুতরাং তথ্যের উৎসটা নিয়ে বেশি চিন্তা আমাদের নেই।প্রশ্ন হল,তথ্য সংগ্রহ কিভাবে কার্যকরী ভাবে করতে পারি?

আপনাকে মাথায় রাখতে হবে,প্রবন্ধ লেখা আপনার ব্যক্তিগত শৈলী।সেটা

আরো ভালো, আরো প্রাঞ্জল হবে আপনার নিজেস্বতাতেই।কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এই তথ্যের গুরুত্ব খুব।কেননা,এগুলোই আপনার প্রবন্ধের বক্তব্য এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি।আপনাকে এর জন্য যেটা করতে হবে,প্রথমত আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারনা থাকা চাই।যে উদ্দেশ্যগুলোই আপনাকে নির্দেশ করবে,কোনধরনের তথ্য আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে।তবে এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হল,আপনাকে আগে উদ্দেশ্যের দিকে খুব বেশি একটা নজর না রেখে এলোমেলো ভাবে বিষয়টার উপর পড়ালেখা করতে হবে।বিষয়টা সম্পর্কিত বেশ কিছু ধারনা যখন আপনি লাভ করবেন ঠিক তখনই আপনি আপনার মূল বিষয়ের জন্য আরো গভীরভাবে পড়া শুরু করবেন।তখনো আপনি তথ্যগুলোর নোট নাও করতে পারেন!

এবার আপনাকে যেটা করতে হবে(ইতিমধ্যে বিষয়টা সম্পর্কে আপনি জেনে নিয়েছেন,যদিও কোন নোট করেন নি এখনো) তাহল, প্রবন্ধটি লেখা শুরু করা।এবং উক্ত তথ্যের যেগুলো আপনার মনে আছে তার উপর নির্ভর করেই ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলা।আর এটিই হল,আপনার মূল প্রবন্ধ এবং নিজেস্ব প্রবন্ধ।এটাকে আমরা বলতে পারি কাঠামো!

আর এতেই এবার আপনাকে মাটি,রঙ সাজসজ্জা পরাতে হবে!

অর্থাৎ নানাভাবে কাটাছেড়া সংযোজন-বিয়োজন করতে হবে।তার জন্য আপনাকে উক্ত তথ্যগুলোর সংস্পর্শে আবার আসতে হবে।ওই তথ্যের কোনটা কোথায় ব্যবহার করবেন তা ভাবতে হবে।এবং ব্যবহার করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হল এই যে, আপনি শুরুতে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন সেখান থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন কোথায় কোন তথ্য ব্যবহার করতে হবে।

এক্ষেত্রে আপনাকে তথ্যসূত্র অবশ্যই নোট করে রাখতে হবে।লেখার শেষে সেগুলো যোগ করতে হবে।আবার বলছি,কীভাবে সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগ করবেন সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত। আর লেখাটিকে পাঠযোগ্য, আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল করে তুলবার দায়িত্বও আপনার।তবে প্রচুর পড়ার অভ্যাস এক্ষেত্রে সুবিদা দিতে পারে।

সমাপ্ত